হাস্যমধুর

হাস্যমধুর

॥ সরস লঘুপাঠ্য লেখার সংকলন ॥

হাস্যমধুর

সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রক :
অনাদিনাথ কুমার
১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

শ্রীযুত আবূ সঈদ

ও

শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের

করকমলে

লেখকের অন্যান্য বই

চতুরঙ্গ

শব্‌নম

দ্বন্দ্বমধুর

মুসাফির

হিটলার

ধূপছায়া

অবিশ্বাস্য

শহর ইয়ার

তুলনাহীনা

জলে-ডাঙায়

কত না অশ্রু জল

ভবঘুরে ও অন্যান্য

সূচী

রসিকতা

হাসতে হয়, না হেসে উপায় নেই। এমন কি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তের' নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণ খুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপেটোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি সরেস গল্প মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলাদেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানস ভাই "প্রাভদা" কাগজ সবচেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে বলে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?'

প্রথম কম্যুনিস্ট : 'কুড়ি বচ্ছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টস্ অ্যাণ্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলারের আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আর এক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌টিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস্? কেন?'

'কি আর হবে? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজী হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে সব কর্তাব্যক্তিরা রুশ চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির' উপরে বসে আছেন তাঁরাও জানেন

মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সব চেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন ও বাধ্য হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই এগুলোর সম্বন্ধে হাড়ে হাড়ে এমনই সচেতন যে, এ নিয়ে মস্করা করে তবু সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নূতন অক্টোবর-রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা না-ও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলাণ্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠরসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরো তিনটে 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যান' চিন্ময় থেকে মৃন্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সক্কলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধোল, 'কোথায় চললি কমরেড?'

'তুই যদি আমার পিছু না নেস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন-শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সঙ্গে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার

সময়! ওদিকে যে রেশন-শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে।'

সত্যিই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর নিত্যিনিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবণ্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কি? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদল করুন। ঢের কম হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস-টিচার শুধোলেন, 'লেনিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছ?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রীমশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, ১৯৬০-এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৬১-তে ১৬০ গুণ। এ বছরে ২০০ গুণ—দাঁড়ান, কি হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিয়ো-অ্যাসিস্টেন্ট্, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকি নি।'

তবে কোনো কোনো বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানি নে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন,

তোমার পাতলুন আর শার্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড়-কাচা বাসন-মাজা রান্না-করা আরো পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ীর মত কাজ করছে, তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাৎলে দেয় কিভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার-প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সক্কলকে হপ্তায় ছু দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মারবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব।]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোরবেলা—এ দেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশী করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'কমরেড, অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা,

'কি বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাই নি।' কিন্তু খবরের কাগজে শোক-সংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশী আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবেদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরী হয় কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীনও খ্রুশ্চফকে গালাগাল দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন-চিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার-খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষা-মন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সবচেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্য কাজ করতে।' সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা, আপনি কি কাজ করেন?' 'আজ্ঞে, আমি গোর খুঁড়ি।' কিংবা,

চেকোস্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, 'রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কণ্ডাক্টর: 'এগিয়ে চলুন মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা "মশাইরা" নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।'

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দু'জনা ওয়াক্-থুঃ ওয়াক্-থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজীতেও বলে, 'নীরবতা হিরণ্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশী। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি-নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যতদূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও 'অন্তরে অন্তরে অন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কি ভাবে আলাপ করে?'

'নিউইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা.

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনো আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা।

তার কারণ উৎপীড়িত জনেরা অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন, এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়াবাড়ি নেই, তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পুলিশকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাখারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডির অলঙ্কারগুলো লক্ষ করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, 'না কই, দে তো।'

'ভেল্টভেখে'র (৩স্থরিখ) ১৪৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

শুধাইনু, 'হে নবীনা, ভালোবাস মোরে কিনা?'
রাঙা হ'ল তার মুখখানি;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা। তাই যবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে সবিতা নিশ্চয় ভাতে
রক্তাকাশ তাই দেয় মানি।

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মত ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রকফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত। এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধ-ঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখনও তার চোখ ভেজা, অথচ তার বাড়ি থেকে যে দিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত, অর্থাৎ দু চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণী-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে মাঝে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অঞ্জন সেনকে বললে, 'অঞ্জনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁছেছি কিনা।'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে আঁতকে উঠে বলল, 'কী বললেন? পৌঁছয় নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো।'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্ত মনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গীর।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি। এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই বকাওলী, তারপর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো, ভালো। গুলম্‌গীর। বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কচিৎ-কস্মিন্। বললেন, 'ল্যাটে —ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক স্টাটিসটিকস সঞ্চয় না করে।' সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিসটিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি তো কাগজে দেখতে পান? আমি আপনার দোরে যাব কেন?

'তবে শোন্। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।'

পার্টিশেনের বছরখানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলায় কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভেতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খানসাহেব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্তেয়ার করেছেন। তা সে যাকগে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধোলে, 'তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?'

আমি একগাল হেসে বললুম, 'স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।'

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধোলে, 'সে কিরে? কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে।'

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানব? আমি পাষণ্ড বটি,—দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, 'শোন।

পার্টিশেনের ফলে মেলা অনিশ্চিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়াল গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক্‌-ই-জাহাঁগীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক্।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজাব চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এ সব তত্ত্ব জানতুম না— সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।'

আমি শুধোলুম, 'কেন? তুমি নিজে খাও না অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম।'

দাদা বললে, 'কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি, তুই একটি চাইল্‌ড্‌ প্রডিজি—ওয়াণ্ডার চাইল্‌ড্‌—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞান-গম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'আর তুমি বিয়াল্লিশে।'—দাদা আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

দাদা বললে, 'তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।'

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার

ইন্‌সিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় "আকাশ-বাণী", ঢক্কা-ডিংডমে" পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডম্‌টা কি চাচা?'

'ডিংডম্‌ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি 'টম্‌টম্‌', 'টমটমিং' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতারকেন্দ্র। তারপর শোন—'

দাদা বললে, 'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে—'

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, 'দেখো, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—'

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, 'দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক্‌ থাক্‌। তুমি বলো।' দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, 'পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সাস্থাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, ব্যাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল এক দুশমন্‌! জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সার মর্ম এই, আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো, যত খুশী তত আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্‌স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন

জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিকঠিক বলতে পারব না—নির্যাসটি জানিয়েছিল গাঁজা-ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকার তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়ত জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—'

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠল। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়? রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন

শোক পাচ্ছেন ? মার্কিনেরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যাণ্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না ?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগরেট ধরিয়ে বললুম, তারপর ? দাদা বললে, 'গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাব, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি ?—বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি-অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্‌সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে ? ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়া মাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে, তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায় নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলায়ও ঐ যদি হয়।

আগে-ভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।'

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, 'কি বললে ?'

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, 'হ্যাঁ তা তো বটেই। "গাঁজা পোড়ানো" কথাটার অর্থ "গাঁজা খাওয়া"ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগরেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগরেট মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।' সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে, গাঁজা পোড়ানো দেখবেন

বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাত যে তুনিয়ার লোক হুদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাকগে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায়, মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টা বাৎ? জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর? সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ আঃ'। কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে তু'হাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসা-রন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মত মুখ হাঁ করে আস্য-মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটাল। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটল সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। তু' একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ, পৃথিবীতে এ-ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে

একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরীব-দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে? আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না—ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার-জনসমাজ দিকনির্ণয়-যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে? আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাত রাখেন।'

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখেমুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদুহাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মত ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কীটুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ও'দক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতনের মত খাড়া হয়ে এদিক-ওদিক কম্প্রমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, 'তুই তো হাসছিস; আমার তখন যা অবস্থা! শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ মাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটা ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন

চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মত ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়েব।

আর এ-স্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মত কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মত, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।'

আমি বললুম, 'দুটো জীপ না কচু!'

দাদা বললে, 'বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আব কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ কবল।'

আমি শুধালুম, 'উড়তে?'

হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?" আমি কিছু বলি নি।'

দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী-সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমস্সুল-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কি হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী-সাহেবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মত কঠোর খেতে কুসুমের মত মোলায়েম শব্‌ডেগ্‌ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল্ গুল্।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গ্যাঁজার গুল।

অর্থাৎ গুলের রাজা 'গুলম্‌গীর'। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?'॥

কলচর

'পরশুরামের' কেদার চাটুজ্যেকে বাঘ তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশ কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি। কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশী, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশী ভূত, অভূত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি। কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছি 'কলচরের' সামনে।

বাঙলাদেশে 'কলচর' আছে কিনা জানি নে; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে হঠাৎ বেমকা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কি দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মতো ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই, এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়তো ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশ-দ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাতুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামী মসজিদের আরাবেস্ক্ ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য-নিদর্শন সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব-নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার-অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়ার, কি গ্যোটে সবযুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে ছ'ছত্র হোথা থেকে তিন পঙ্‌ক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা ; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায়, কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনো পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাকৃগে। না পালাবার অন্য আবেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই, আমি পালাব কেন?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরে মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হাব মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্ট আর উড্ডায়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই লিফ্ট উপরের দিকে চলল, পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্ট সেখানে থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মধ্যিখানে।

একে তো গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহন্নতে পাওয়া যায়; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেবাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম।

ওঁরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল, আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

''কলচরড্' নই, তাই বলতে পারবো না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই॥

শুধাযোনা ঘড়িটারে • কটা বাজে এইবারে

লাভ কিবা ভাই

বউ বকে দশটায় যে বকাটা তিনটায়

তফাৎ তো নাই।

রক শুধালে, 'চাচা, আপনি 'রীডারস্ ডিজেস্ট' পড়েন ?'

আমি বললুম, 'না, ভাই। ওতে আমার দিল্-চস্পী নেই।'

ঘন্টুর শব্দতত্ত্বে কোনো প্রকারের 'দিল্-চস্পী' থাকার কথা নয়। তবু শুধোলে, 'চাচা, আপনার মুখে এ শব্দটা একাধিকবার শুনেছি। হালে সিনেমাতে শব্দটা একই ফিল্মে বার তিনেক কানে গেল। মানেটা কি ?'

আমি বললুম, 'দিল শব্দটা তো জানিস—হৃদয়। আর ফার্সীতে 'চস্পীদন' শব্দের অর্থ সেঁটে যাওয়া, সেঁটে দেওয়া। অর্থাৎ বুকে বুক লাগানো। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা। ইংরিজি 'ইনট্রেস্ট্' শব্দের ঠিক বাঙলা নেই। ফার্সী এবং উর্দুতে বলে দিল-চস্পী। যেমন গাওনা-বাজনায় আমার খুব দিল্-চস্পী আছে, কিন্তু রেসে বিলকুল দিল্-চস্পী নেই।'

মশাদা বললে, 'তারো ভালো উদাহরণ : টাকা ধার নেওয়াতে আমার বিস্তর দিল্-চস্পী—'

ঘন্টু বাকিটা পূর্ণ করে দিলে, কিন্তু ফেরত দেওয়াতে বে-দিল্-চস্পী।'

আমি বললুম, 'বেদিল্চস্পী আমি কখনো শুনি নি।'

টেটেন শুধোলে, 'কিন্তু ডিজেস্ট ভাল লাগে না কেন ?'

আমি বললুম, 'পুরো এক থালা যেন চাটনি : ফরাসীতে যাকে বলে 'অর দ্যভ্র'—ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো সসিজ, সার্ডিন, অলিভ—যা খেতে গিয়ে, আসলে কিন্তু হার্ট ট্রাবলে, মুখুয্যে জাপানে গত হলেন। শক্ত কামড়াবার মত কিছুই থাকে না—যাকে ফরাসীতে বলে 'পিয়েস্ দ্য রেজিস্তাঁস পীস অব রেজিস্টেন্স।'

টেটেন বললে, 'কিন্তু সর্বশেষে যে মোটা বইয়ের সারাংশ থাকে ?'

আমি বললুম, 'সে যেন গ্লাস-কেসের ভিতরকার খুদে তাজমহল। ওতে যদি সেই আনন্দই পাওয়া যেত, তবে আসল তাজ দেখতে যেত কে ?'

অজনদা শুধোলে, কিন্তু মশার চোখ যদি আরো দু'ইঞ্চি ছোট হত তা হলে কি কিছু ফের-ফার হত ?'

বড়দা কথা কয় কম কিন্তু কেউ কাউকে ছোবল মারলে সেও সরেস মাল ছাড়তে জানে। পানের পিচ বাঁচিয়ে আকাশপানে মুখ তুলে বললে, 'তোমার ঐ ভেটকি বদন দেখার থেকে নিষ্কৃতি পেত।'

টেটেন বললে, 'কী বিপদ! আমার প্রশ্নটা শুধোবার ফুরসতই পাচ্ছি নে যে! আচ্ছা, চাচা, ঐ যে 'আমার পরিচয়ের অবিস্মরণীয় মানুষ' ঐ সিরীজের লেখাগুলো কি সত্যি, না-বানানো ?'

আমি অনেকক্ষণ মাথা চুলকে বললুম, 'মিথ্যা আর সত্যে পার্থক্য করা কঠিন—বিশেষ করে আর্টে. সাহিত্যে। যেমন মনে কর্, তুই একটা ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্ট করছিস। সেখানে একটা শুকনো খেজুর গাছ তোর পছন্দ না হওয়াতে তুই সেটা তুলে দিয়ে সেখানে একটা কদম গাছ লাগালে কেউ কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু যদি কারো ফোটোগ্রাফ তুলতে চাস তবে সেখানে কোনো লিবার্টি নেওয়া চলবে না। অথচ সেখানেও সমূহ বিপদ। লেন্‌স্‌টার উপরে হয়তো ময়লা জমেছে ফিল্মটা হয়তো পুরনো, ফোকাসে ভুল হয়ে গেল—ফলে মূলের সঙ্গে মিল রইল কমই। ঠিক তেমনি 'আমার অবিস্মরণীয় মানুষের' বর্ণনা আমি যখন দিই তখন ভাবি সত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়েই সেটা আমি করছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গি (লেন্‌স্) আমার স্মৃতিশক্তি (ফিল্‌ম—পুর্ণা কিংবা নয়া ঘটনা) যে ঠিক ঠিক বর্ণনা দিতে সাহায্য করছে কি করে জানবো ? তিন সাধু জন আদালতে

হলফ খেয়ে তিন রকমের বর্ণনা দেয়—সে তো আকছারই হচ্ছে। আর যে 'অবিস্মরণীয় চরিত্রের' বর্ণনাটা পড়ে তোর প্রাণটা জুড়িয়ে গেল, সেই 'চরিত্রকে' সেটা পড়ে শোনালে সে হয়তো ঝাঁটা হাতে তাড়া লাগাত। আমার এ রকম একটা চরিত্রেব সঙ্গে—'

মুকুলদি কিমামের কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'সেইটেই দয়া করে বলুন—এসব আবোল-তাবোল বকে কি হবে?' মুকুলদি উত্তম মুভি তুলতে জানে, ছবিও আঁকতে পারে; তাই এসব থিয়োরিতে তার দিল্-চস্‌পী নেই। পোস্ট-মর্টেমে খুনীর কি ইন্‌ট্রেস্‌ট্?

* * *

'সে আমার প্রথম যৌবনের কথা। দেশে ফিরে বসেছি বড়দার বৈঠকখানার বারান্দায়। এমন সময় দেখি, রাস্তার উপর দিয়ে দূর থেকে যেন একটা সাক্ষাৎ তালগাছ ঝড়ের বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বাড়ির সামনে আসতে দেখি, সে এক অপরূপ প্রাণী। নিদেন ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তার উপরে ভদ্রলোক পরেছেন প্রায় এক ফুট উঁচু তুর্কী টুপী। ঝড়ের মত চলার বেগে সেই টুপীর ফুন্না বা ট্যাসেল টুপীর উপরে চকিবাজির মত চক্কর খাচ্ছে। বারান্দা থেকে রাস্তা অন্তত দশ গজ দূরে, তবু তাঁর গতি বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার সেই দু ফুট চওড়া বিরাট পুরু লংক্লথের পাজামার ঘর্ষণ থেকে। কদম এক একখানা যে দৈর্ঘ্যের ফেলছেন তাতে মনে হয় পাজামার ভিতর বুঝি রণ-পা লুকনো রয়েছে। আচকানটা নেমে এসেছে প্রায় জুতো পর্যন্ত—পাজামার ইঞ্চি চারেক দেখা যায় কি না যায়। ইয়া বিরাট চাপদাড়িতে বুক ঢাকা। তুর্কী-টুপীর নিচের থেকে নেমে এসেছে ঢেউ-খেলানো মিশকালো ঘন বাবরি চুল—প্রায় গ্রেটা গার্বো স্টাইলে। চলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা দুলছে যেন সার্কাসের লোহার ডাণ্ডার দুলনা তাঁবুর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি। বাঁ বগলে ফুলস্ক্যাপ কাগজের রোল করা এক বিরাট বোন্দা। দৃষ্টি সোজা সমুখ পানে। চলেছেন রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে।

সাঁইসাঁই শব্দ করে তিনি আমাদের বৈঠকখানা পেরিয়ে গিয়ে মোড় নিলেন বাবার বৈঠকখানার দিকে।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই বাবার চাপরাশী মহরমদী এসে আমায় তলব করলে। ফতুয়াটা গায়ে চড়াতে না চড়াতেই দেখি সেই আচকান-পাজামা-পরা তালগাছ পূর্বের চেয়েও গতি বাড়িয়ে আমাদের বারান্দায় এসে হাজির। আমি সালাম করার পূর্বেই আমাকে সালাম করে আসন নিলেন শক্ত কাঠের চেয়ারের উপর—যদিও আমি বেতের চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়েছিলুম।

কুশলাদির প্রথম কথাতেই আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর গলা শুনে। আমি ভেবেছিলুম, তাঁর গলা থেকে প্রতিটি লব্‌জো বেরবে তোপের শব্দ নিয়ে, নিদেনপক্ষে বন্দেমাতরমের আওয়াজ ছেড়ে। কোথায় কি? ঠিক যেন ওস্তাদ আব্দুল করীম খান সাহেবের মধুর কণ্ঠস্বর—এবং সেও এত মৃদু যে তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না। গলা থেকে মানুষ চিনতে গেলে বলতে হবে লোকটি বড়ই নিরীহ। আর দ্বিতীয় জিনিস লক্ষ্য করে আরো আশ্চর্য হলুম। ঐ বিরাট-বপু লোকটার জুতোর নম্বর ছয় হয় কি না হয়।

বোধ হয় একটুখানি সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'দেখুন দেখি, আপনার ওয়ালিদ্‌ সাহেব (পিতা) আমাকে কি বিপদে ফেলেছিলেন। আপনাকে ডেকে পাঠাসেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে! তাও কখনো হয়! আমি তো একরকম তাঁর ইচ্ছা অমান্য করেই এখানে ছুটে এলুম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি আপত্তি করেন নি।'

কথাবার্তায় প্রকাশ পেল তিনি মৌলানা জলাল উদ্দীন রুমীর কাব্য মসনবীখানা অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছেন। আমার পিতৃদেবকে দেখাতে এসেছিলেন। তিনি শুনে বলেছেন, এসব ব্যাপারে নাকি আমার দিল্‌-চস্‌পী প্রচুর। তাই আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

আমি তো অবাক! বিরাট সে গ্রন্থ। সে আমলে এর ইংরিজি অনুবাদও কেউ বুক বেঁধে করে উঠতে পারে নি।'

মশাদা শুধোলে, 'কে যেন তাঁর একটি গল্প 'তোতা-কাহিনী' না কি যেন অনুবাদ করেছে- তাও গদ্যে। কিন্তু গল্পটি অসাধারণ সুন্দর। পুরো কাব্য কি এখন ইংরিজিতে পাওয়া যায়?'

আমি বললুম, 'যায়। নিকল্‌সন্ না কে যেন দশ বা চোদ্দ বছর খেটে করেছে—তাও গদ্যে।

আর সে কাব্য অনুবাদ করা কি চারটিখানি কথা!'

মশাদা বললে, 'বড্ড কঠিন নাকি?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। অতি সহজ। মিল, ছন্দ, উপমা, ধ্বনি এত সহজ যে অনুবাদে সে সরলতা কিছুতেই আনা যায় না। এ ধরনের বইকেই ইংরিজিতে বলা হয়, ডিস্‌পেয়ার অব্ ট্রেনসলেটারস্।

ভদ্রলোক তখন বিস্তর ইতি-উতি করার পর বগলের বোন্দাটা নামিয়ে, লম্বা ফুলস্কেপ কাগজ হাত দিয়ে ডলে সোজা করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

রকফেলাররা একবাক্যে শুধোলে, 'কি রকম হয়েছিল অনুবাদটা?'

আমাদের রকের এই একটা মস্ত গুণ যে সবাই বড় দরদী। প্রশ্নের সুরেই বোঝা গেল তারা কি উত্তর প্রত্যাশা করছে।

টেটেনের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এখন বুঝলি টেটেন, সত্য-কথন কতখানি কঠিন, হুবহু ফোটোগ্রাফ তোলাতে কতখানি কস্ত।'

টেটেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'একদম রদ্দি বুঝি?'

আমি বললুম, 'না, এই মাঝারি বরঞ্চ বলবো, মসনবী অনুবাদ কী কঠিন কর্ম জানা ছিল বলে মনে হল, আশাতীত ভালো। আর ছন্দটি নিয়েছিলেন রাজসিক, তাঁর দাড়ির চেয়েও লম্বা—

'কন সদাগর তোতা পাখীটিরে কোনো ভয় তুমি রেখ না মনে,
সওগাত আমি নিশ্চয় আনিব খুঁজিবো তাহারে শহরে বনে'

মশা বললে, 'তার পর?'

ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'অনুবাদটা আমারই পছন্দসই হয় নি। কিন্তু কি জানেন, এটা পড়ে যদি যোগ্যতর ব্যক্তি একখানা উত্তম অনুবাদ করে তবেই আমার শ্রম সফল।'

এতখানি বিবেচক লোককে উৎসাহ দেবে না কোন পাষণ্ড। আমি বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান।'

রাত্রিবেলা বাবার কাছে শুনলুম, ভদ্রলোক ছ'মাইল দূরে গ্রামে বাস করেন, সেখানকার ম্যারিজ রেজিস্ট্রার, অর্থাৎ কাজীসাহেব। ঝাড়া পনেরো বছর মুসলমান শাস্ত্রাদি দিল্লী (দেওবন্দ), রামপুরে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরেছেন। ফার্সী এবং উর্দুতে উত্তম কবিতা লিখতে পারেন, কিন্তু দিল্-চস্পী বাঙলাতে,—যদিও পাঠশালার পর বাঙলা অধ্যয়নের সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠে নি।

একটা পান দে না রে, ও মুকুলদি।

তারপর কাজীসাহেব মাঝে মাঝে আসেন, অনুবাদ শুনিয়ে যান।

আমার মা ওঁকে খাওয়াতে বড্ড ভালোবাসতেন। কি করে জানি নে, জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, পাছে তাঁর স্ত্রী ভাবেন তিনি একটা আস্ত রাক্ষস তাই বাড়িতে খান অল্পই। মা'র হয়ে আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করতুম আর তিনি প্রতিবার খেয়ে উঠে দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বলতেন, 'এই বাড়িতেই আল্লা আমার দানা-পানি রেখেছিল।'

এর কিছুদিন পরেই আমাদেব অঞ্চলে হাহাকার উঠলো। ফেঁচুগঞ্জ অঞ্চলে খেয়ানৌকো ডুবিতে বিস্তর লোক মারা গিয়েছে—পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যতটা ভয় করা হয়েছিল ততটা নয়—কারণ সিলেট পানি-জলের দেশ—সাঁতারে অক্ষম অল্প লোকই। কিন্তু আসল কথা খবরের কাগজে বেরল পরের দিন :—

"প্রকাশ, মুনশীবাজার গ্রামের কাজী মৌলবী শের মুহম্মদ খান ঐ খেয়ানৌকা ডুবির সময় একটি মণিপুরী রমণীকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন। রমণী সন্তরণে সম্পুর্ণ অক্ষম। কাজীসাহেব সেই রমণীকে অবশ্যমৃত্যুর

হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্রোতের সঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ সন্তরণ করিয়া অবশেষে তীরে অবতীর্ণ হয়েন। আরো প্রকাশ, মণিপুরী রমণীর ওজন প্রায় আড়াই মণ এবং কাজীসাহেব যখন পারে অবতীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার ইজার-আচকান এমন কি তাঁহার তুর্কী টুপী কিংবা একটি পাদুকাও স্থানচ্যুত হয় নাই।"

হাজরা রোডের রক্ হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'শাবাশ।'

অজনদা বললে, 'চাচা, আপনার বর্ণনাতে যা হয় নি, এই ঘটনার বিবৃতিতে তা হয়ে গেল—এতক্ষণে বুঝলুম, আপনার কাজীসাহেবের গতরে কী অসুরেরই জোর ছিল।'

বড়দা বললেন, 'ল্যাটে বুঝলে হে অজন, ল্যাটে।'

আমি বললুম, খবরটা প্রথমে পড়েছিলেন বাবা। তিনি আমাদের সবাইকে ডেকে সেইটে রসিয়ে রসিয়ে পড়লেন। দেখি, দেমাকে মাটিতে তাঁর পা পড়ছে না—তাঁর কাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

ইতিমধ্যে চাপরাশী মহরমদী এসে উপস্থিত। সে বাজারে খবরটা শুনে এসেছে। আস্তে আস্তে আমাকে বললে, 'জানেন, ঐ মণিপুরী ঔরৎটা কে?' আমি বললুম, 'না তো'। বললে 'ঐ যে হাতীর গতর ইয়া লাশ বেটি। হাটের দিন আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে ধামায় করে গামছা বিক্রি করতে যায়।'

বাবা, দাদারা আমি সবাই স্তম্ভিত। ও রমণীর বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। বোন্দা বোন্দা, পিণ্ড পিণ্ড, ধামা ধামা স্রেফ চর্বি দিয়ে তৈরী সে রমণীর দেহ। মাথায় ধামা। সর্বাঙ্গ থলথল করছে আর ঘোর শীতকালেও সর্বদেহ থেকে গলগল করে ঘাম ঝরছে। হাঁপাচ্ছে আর এগোচ্ছে, গাছতলায় বসে জিরোচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে। প্রতিদিন চর্বির গোলা বেড়েই যাচ্ছে এবং শেষের দিকে ওর ঠেলায় তার মুখ চোখদুটো প্রায় দেখাই যেত না। এই তো দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে।

নদীর স্রোতে কাজীসাহেব এই হিমালয় বয়েছেন পাক্কা এক কোশ।

আমার বাবা প্রাচীনপন্থী ধর্মভীরু লোক ছিলেন। বেপর্দা রমণীর দিকে তাকাতেন না। এখন দেখা গেল, সে রমণী তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'ও, তাই নাকি!' বলে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। আমরা গুড়িগুড়ি বড়দার বৈঠকখানায় গিয়ে প্রথম এক চোট চাপা হাসিটা হেসে নিলুম—সকলের মুখে ঐ এক কথা, 'সমুচা তুর্কী-টুপী জুতো সহ কাজীসাহেব উঠলেন নদীর ওপারে—ঔর বগলমে মণিপুরী ঔরৎ—ইয়া লাশ।'

ইতিমধ্যে বাবা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন একখানা পোস্টকাড—কাজীসাহেব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে এবং একটি মানুষের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা। আমরা পড়ে ডাকে পাঠিয়ে দিলুম।

দিন দুই পর সে কী তুল-কালাম কাণ্ড! প্রথমটায় দেখলুম কাজীসাহেব টর্নাডো বেগে উঠছেন বাবার বারান্দায়—আর এই প্রথম দেখলুম, তাঁর বগলে মসনবীর বোন্দা নেই, যদিও হাটে মাঠে ঘাটে খেয়াপারে মসজিদে তাঁকে বোন্দাহীন অবস্থায় কেউ কখনো দেখে নি। আর এই প্রথম শুনি তাঁব সেই মৃদুল স্বর আর নেই। নাক দিয়ে সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণী বলদের মত শ্বাস-নিশ্বাস প্রস্ফুরিত হচ্ছে, চাপদাড়ি চিত্তিরবিত্তির ছড়িয়ে পড়েছে, চোখে মুখে জুগুপ্সা—জিঘাংসা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আর বার বার একই কথা বলছেন, 'আপনিও, আপনিও!'

আমরা হাবা বনে খনে বাবার দিকে খনে কাজীসাহেবের দিকে তাকাই। বাবাই বুঝিয়ে বললেন, 'কাজী বলছেন, ঐ মণিপুরীকে বাঁচাবার কোনো মতলবই তাঁর ছিল না, তিনি নাকি—'

কাজীসাহেব ককিয়ে উঠলেন, 'আমাকে ধরেছে কোমরে জাবড়ে। তওবা, তওবা, কী ঘেন্না—' তিনি তাঁরই স্মরণে যেন শিউরে উঠলেন।

আমরা যে হাসি ঠেকাতে পেরেছিলুম সে নিতান্তই আল্লার মেহেরবানি।

কাজীসাহেব বার বার বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তিনি রুস্তম নন, সোহরাব নন, কারো প্রাণরক্ষা করে বীরপুরুষের খ্যাতি তিনি চান না, তিনি আপন প্রাণ নিয়েই তখন ব্যস্ত, ঐ দুশ্‌মন রমণীটা যদি ও-রকম তাঁকে জাবড়ে না ধরতো—আরো কত কী।

বাবা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'চেষ্টা করলেই তো আপনি নিষ্কৃতি পেতে পারতেন।'

কাজীসাহেবের চোখের তারা তুর্কী-টুপীর ফুন্নায় গিয়ে ঠেকেছে। এবারে কক্‌কিয়ে বললেন, 'হুজুর ঐ ঔরতের লাশ তো দেখেন নি—তাই বললেন।'

নিতান্ত সত্যের অপলাপ হয় বলে বাবাকে আপত্তি জানাতে হল।

আমি বললুম, 'যাকে আপনি দু'মাইল বয়ে নিয়ে যেতে পারলেন—'

কাজীসাহেব প্রায় কেঁদে উঠলেন, 'কে বলে দু'মাইল।' আমি ঐ খবরের কাগজওলাদের যদি একদিন পাই।' হাত দুটো তিনি মুষ্টিবদ্ধ করলেন। 'এক মাইল হয় কি না হয়।' আমরা বললুম, 'এক মাইলই সই, আধ মাইলও সই—তাই কি কম? ফেঁচুগঞ্জের ঐ জলের তোড়ে, মাঝ গাঙে—'

কাজীসাহেব বললেন, 'মাঝগাঙে তোড় কম—'

মোদ্দাকথা কাজীসাহেবের গোড়ার দিককার বিরক্তি এখন ঘোর ক্রোধে পরিণত হয়েছে। টেলিগ্রাম, চিঠি, গ্রামের ছোঁড়াদের 'জিন্দাবাদ' চীৎকারে তাঁর সুখ-শান্তি গেছে। মসনবী সিকেয় উঠেছেন। তাকে আত্মত্যাগী, মৃত্যুভয়ে অকাতর পরম বীরপুরুষ বানিয়ে কতকগুলো বাঁদর তাঁকে বাঁদর-নাচ নাচাতে চায়। তিনি ঐ মর্মে একটি দেমাঁতি (dementi)—প্রতিবাদ—লিখেছেন।

সেইটে বাবাকে দেখিয়ে কাগজে পাঠাবেন, এমন সময় বাবার কার্ড পৌছে তাঁর হৃদয়-বেদনা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবাদটি তিনি লিখেছিলেন অতিশয় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে—যদিও অজ্ঞলোক সেটাকে বাঙলা মনে করতে পারে,—

"এতদ্দারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাত কৃত হইতেছে যে অধম শের মুহম্মদ খান কদাপি বীরর্ষভ নহে। আত্মরক্ষার্থেই সে শশব্যস্ত—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

প্রতিবাদটি পড়তে পড়তে এত দুঃখের ভিতরেও কাজীসাহেবের মুখে এই প্রথম এক ছটাক হাসি ফুটলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'ভাষাটা কি রকম হয়েছে?'

কোরাস

বড়দা—'অপূর্ব, অপূর্ব!'

মেজদা—'অনবদ্য, অনবদ্য!'

আমি—'সাধু, সাধু।'

বাবা বললেন, 'পত্রিকাওলারা এটা ছাপাবে না।'

কাজীসাহেব আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'হক কথার প্রতি তাদের কি কোনোই মহব্বৎ নেই?'

বাবা বললেন, 'ওরা একটা জিনিস নিয়ে মেতেছে। যে বেলুন উড়িয়েছে সেটা নিজেরাই ফুটো করতে যাবে কেন?'

এমন সময় আমাদের বাড়ির বুড়ী দাসী এসে বললে, মা বলে পাঠিয়েছেন, কাজীসাহেব যেন নেয়ে খেয়ে যান—এরকম লোককে নাকি খাইয়ে সুখ।

'ইয়াল্লা' বলে কাজীসাহেব দু'হাতে মাথা চেপে তক্তপোশে বসে পড়লেন।

অজনদা আমাদের ভিতর বিচক্ষণ সংসারী লোক। সে বললে, 'চাচা, আপনারা ধীরস্থিরভাবে ওঁকে বোঝালেন না কেন, তিনি যত আপত্তি জানাবেন শ্রাদ্ধটা তত বেশী গড়াবে! তিনি চুপ মেরে থাকলে গেরোটা আপনার থেকেই খুলে যাবে।'

আমি বললুম, 'বাবা তো ওঁকে সেই কথাই বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজীসাহেবের আপত্তি—তা হলে তিনি যে একটি মহাপুরুষ সে 'অপবাদ' যে তাঁর থেকেই যাবে।

তা সে যা-ই হোক, আমরা প্রতীক্ষা করে রইলুম, কাগজ প্রতিবাদ ছাপায় কিনা। আমরা থাকি মহকুমা টাউনে, কাগজ বেরয় সদরে

বুধবার সকালে কাগজ আসবার কথা। মঙ্গলবার রাত দশটায় কাজীসাহেব পুনরায় তেড়ে উঠলেন বাবার বারান্দায়। তিনি আকছারই চোদ্দমাইল দূরের স্টেশনে 'বেড়াতে' যেতেন। সেখান থেকে কাগজখানা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমাদের অনুমান ভুল, 'বিজয়শঙ্খ' ফলাও করে কাজীসাহেবের দেমাতি ছাপিয়েছে। কিন্তু—

কাজীসাহেব চিল-চ্যাচানিতে ডুকরে উঠলেন, 'দেখুন, কি সম্পাদকীয় লিখেছে! তারপর কাতর কণ্ঠে বাবাকে বললেন, 'খান বাহাদুর সাহেব, আল্লা আমার সাক্ষী,—আমি জীবনে কখনো কারো অমঙ্গল কামনা করি নি, তবে এরা আমার পিছনে লেগেছে কেন?'

বড়দা চেঁচিয়ে পড়লেন, "আমরা বাঙালী। বঙ্গভাষা আমাদের ভাষা। বঙ্গীয় সমাজ আমাদের সমাজ। মা বঙ্গভারতী, তোমার বিজয়-শঙ্খ এই পতিত জাতির পাপ-তাপ দূর করুক।"

রক এক বাক্যে চেঁচিয়ে বললে, 'চাচা, আপনার মেমারিটা খাসা।'

আমি বললুম, 'মেমারি না কচু!' 'বিজয়শঙ্খে'র সম্পাদক দু-হপ্তা অন্তর অন্তর এই ফরমূলা মোকা-বেমোকায় কোনো না কোনো জায়গায় ঢুকিয়ে দিত, তাই সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। তা সে যাই হোক বঙ্গভারতী-টারতীতে কাজীসাহেবের কণামাত্র আপত্তি নেই—আপত্তি যেখানে সম্পাদক বলেছে, "ও হো হো, কি অসাধারণ বিনয়ী পুরুষ! সম্পূর্ণা অপরিচিতা রমণীর জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত মহাপুরুষের পক্ষেই এবম্বিধ বিনয় সম্ভবে। অপিচ এই ঘোর কলিকালে অন্যপক্ষ হইলে আমরা হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করিতাম, কিন্তু কাজী শের মুহম্মদ

খানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের যোগাযোগ পূর্বাহ্ণেই একাধিকবার হইয়া গিয়াছে।"

বড়দা এক এক লাইন পড়েন। আর পুরনো তানপুরোর কান মললে যে রকম সেটা কঁ্যাও-ম্যাও করে ওঠে, কাজীসাহেব তেমনি আর্তনাদ করে ওঠেন।

বড়দা দরদী দিঠি হেনে পড়ে গেলেন, "ত্রিযামা যামিনী প্রদীপশিখা অনির্বাণ রাখিয়া তিনি যে পারস্যের কবিশেখর মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমার পর্বতপ্রমাণ বিরাট মসনবী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গদে কুণ্ডলে বিজয়মাল্য পরিধান করাইতেছেন, তাহা কি আমাদের ন্যায় অর্বাচীন জনেরও অজ্ঞাত?"

কাজীসাহেব দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে বললেন, 'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ।'

মেজদা বললেন, 'কাজীসাহেব, এ আপনার অন্যায়। অবিনাশ চক্রবর্তী এস্থলে ভদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের কর্তব্যকর্ম করেছে—কণামাত্র মিথ্যা বলে নি।'

কাজাসাহেব মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'না বিয়োতেই কানাইয়ের মা।'

কিন্তু কাজীসাহেবের 'পুণ্যে'র ভার পূর্ণ হল যখন দেখা গেল সর্বশেষে সম্পাদক অবিনাশ চক্রবর্তী তর্ক-চুঞ্চু সদাশয় সরকার তথা ছোটলাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ দেশমাতৃকার হয়ে তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছেন কাজীসাহেবের এই বীরত্বের যেন যথোপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়, এবং এই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বর্ণপদক-দানের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তারও উল্লেখ করেছেন।

কাজীসাহেব ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়িমুখো হলেন। আমরা কিছুতেই তাঁকে ঠেকাতে পারলুম না।

ঘণ্ট, বললে, 'একেবারে ক্লাইমেক্সে পৌচেছে তখন। তারপর?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। তবে আমার কপাল ভালো, কাজীসাহেবের সে-'দুর্গতি' আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হয় নি। আর কিছু দিন পরেই

আমাকে ফের বিদেশে যেতে হল। তবে আমার ছোট বোন আমাকে জানালে, যখন 'বিজয়শঙ্খ'ই প্রথম খবর ছাপে যে সদাশয় সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে স্থির হয়েছে, কাজীসাহেবকে একটি গোল্ড-মেডেল দেওয়া হবে, তখন তিনি বাবার কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করবেন কি না, কিংবা লাটসাহেবকে—তাঁরই স্বহস্তে মেডেল পরিয়ে দেবার কথা—সব কথা গোপনে চিঠি লিখে জানাবেন কি না,—কারণ সবাই নাকি তাঁকে বলেছে, এসবের কোনো-কিছুটা করলেই লাটসাহেব বিগড়ে যেতে পারেন এবং তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি লেগে যেতে পারে। বাবা বলেছেন, ওর উচ্চবাচ্য না করাই উচিত।'

দম নিয়ে বললুম, 'কাজীসাহেবের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই বোধহয় তিনি মেডেল নিতে রাজী হয়েছিলেন। চাকরি গেলে বাবীকে খাওয়াবেন কি?

কিন্তু আমি কল্পনার চোখেও দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠি।

বিরাট সভা। লেকচারের পর লেকচার চলেছে কাজীসাহেবের বীরত্বের গুণকীর্তন করে, অবিনাশ চক্রবর্তী তর্ক-চুঞ্চুর রচিত বিশেষ গান গাওয়া হচ্ছে, কাজীসাহেবের গলা জিরাফের মত লম্বা হলেও অত মালার স্থান হয় না, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গদ্যে পদ্যে হরেক রকম অভিনন্দন পড়া হচ্ছে, কাজীসাহেবের গাঁয়ের লোক বিস্তর নৌকো ভাড়া করে এসে সভাস্থল গুলজার করে তুলেছে—আর তার মধ্যিখানে কাজীসাহেব ঘেমে ঢোল—ভাবছেন, আল্লায় মালুম কি ভাবছেন, এ কী উৎকট সংকট, এ কী দুঃস্বপ্ন, এ কী বিভীষিকা।

বোন লিখেছিল, সেদিন সন্ধ্যায়ই শহরে খবর রটে, লাটসাহেবের এডিসি নাকি শুনেছে, সায়েব কাজীসাহেবের আচকানে মেডেলটি যখন পিন করেন তখন নাকি মৃদুকণ্ঠে ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলেছিলেন, 'কাজী, তোমার সাহসের সঙ্গে মিলিয়ে গড্ তোমার দেহ দিয়েছেন। কোনোটারই অবহেলা করো না।'

সর্বনাশ!

কাজীসাহেবের শেষ ভরসাটুকুও গেল। তিনি মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন, মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধি, দেশের রাজা লাটসাহেব অন্তত ধরে ফেলতে পারবেন যে তিনি হীরো নন।'

*　　　　*　　　　*

রকফেলারগণ প্রথমটায় চুপ। তারপর কলরব করে অনেকগুলো প্রশ্ন শুধোলে। রকের বড়দা এ পাড়ার একটি মাত্র লোক যে পয়সা দিয়ে বই কিনে পড়ে। মুখ উপরের দিকে তুলে তারই গহ্বরে এক মুঠো ঔড্রদেশীয় গুণ্ডি ফেলে শুধালে, 'আর মসনবী না কি যেন—তার কি হল?'

"দিল গুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্ক্রা
শমরা ফানুস পন্দাবদ্ কি পিনহান্ করদে অস্ত।"

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাঁচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছে শিখাটাবে।

"তঙ্গ দস্তীমে কৌন্ কিসুকা সাথ দেতা হৈ?
কি তারিকীমেঁ সায়াভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে!"

দুর্দিনে, বল, কোথা সে স্বজন হেথা তব সাথী হয়
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়।

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা—ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোরবেলা থেকে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে,' 'ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশ বার শুনতে হয় না। আর গয়না-গাটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি-পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি-পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিন-মজুর ; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার।

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি-পনীর ও'য়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব-আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব-আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে।

স্থির করলো, ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়াপ্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি

আর সাহস করে আসত ? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসে নি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি-কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতাপাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা'টা ম্যাজম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে ?'

বউ তো খলখল করে হাসলে পৌঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো, মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে।'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিলে এক মোক্কম ধাক্কা। তারপর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগে রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যতবার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউ তো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ

নেয় নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশ্‌মনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্‌গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহম্মদ দেখে—বাপ সে বাপ, এ্যাব্বড়া কাল-নাগ, কুলোপানা-চক্কর সাপ! সে তখনো চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সংবিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল সাপকে বললে, 'তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে অত ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধাত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মদ্দা-মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল-চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ ত্য দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে পড়তুম না? সারাতো কোন ওঝা? ওসব পাগলামো রাখো। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা স্থলেমানের কসম।'

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলে নি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাতেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে স্থলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সে-ও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর-মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজের পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতোয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এস্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, এ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুল-কামাল কাণ্ড যে তিন দিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতোয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ কোঁসকোঁস করছে। কোতোয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা মনসার বাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল, এখন ফার্সী পড়ে আগা? কী বা বেশ কী বা ছিরি!

কোতোয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তার পর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকা মাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতোয়াল-নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণদর্শন কোতোয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খামনও অন্ত ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে।

হাতের কাছে ওঝা
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি-লোভ ভালো না—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমনধারা কখনো হয়।'

আগাকে জোর করে পাল্কীতে তুলে দেওয়া হয়।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাই বড্ড বেড়েছে—না?—তোমাকে না পইপই করে বারণ করেছিলুম একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষবার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচ শ' ঘোড়ার মসনব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে, আর সে ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতোয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে

তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতোয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতোয়ালের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহর-দারোগাকে হুকুম দিলেন, "চড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু-পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতোয়াল-নন্দিনী, অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদ-মৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে। স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন। আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসি নি। তুমি আমাকে অগুণতি দৌলত দিয়েছ। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম, তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলছিলেন, তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি—তুমি আমার—

'বাপ রে, মা রে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাঈ-তে শুয়ে শুয়ে। কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার 'মরাল' কি, বলো তো।'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল' থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার 'মরাল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য 'মরাল'-টা গভীর :—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তার পরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনে-প্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে তবে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্যনবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ-ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।

(শ্রমণ বিয়োকোয়ান)

খোশগল্প

যখন তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড়ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে বাচ্যা চাইলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না। নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুৎ) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানতো, রাব্বী গল্প বলাতে ভারী ওস্তাদ। পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আবস্ত করছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো! এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার মুখে স্বামীকে শুধালো, 'এ কি ছাগী আনলে গা?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানাপানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপর-ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইক্ল চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার কি? এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, অর্থাৎ এক চিন্তার

খেই ধরে অন্য চিন্তা, সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এই রকম করে করে মোকামে পৌঁছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক—যা-কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পৌঁছে যাবেই যাবে মিষ্টি-সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য : 'লক্ষ' না বলে বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে ; তার পর বলছে,)

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য : 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ চলে গেল অগ্রহায়ণ-পৌষে)

'অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ, ছেলে-পিলে—'

(মন্তব্য : 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে-পিলে')

'পিলে, জ্বর, সর্দি, কাশী—'

(মন্তব্য : তার থেকে যাবতীয় তীর্থ!—)

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী—'

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যস! পুরী তো খাদ্য, এবং ভালো খাদ্য অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদ বাকি উত্তম উত্তম আহারাদি। পৌঁছে গেল মোকামে!

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়। ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদির কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যত রকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে

যাবে। •ঠিক সেই রকম আরো গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্লকে এ দেশে গোপাল ভাঁড় সাইক্ল বলা হয়। অর্থাৎ চালাকির যে কোন গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরিজিতে এটাকে 'ব্ল্যাঙ্কেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কল্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলশাফ্‌ট্‌ফেইষ নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশী, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্‌ ববে, পশ্চিম-ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধকরি শ্রীযুক্তা সীতা শান্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এঁর গল্প আছে) এবং সুইজারল্যাণ্ডে পল্‌ডি।

পল্‌ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস্‌ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্‌ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি :—

বন্ধু : জানো পল্‌ডি, অক্‌সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্‌ডি : তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে ?

কিংবা

পল্‌ডি : (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল্‌ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে ?

টুরিস্ট : হাসপাতালে।

পল্‌ডি : সর্বনাশ ! কি হয়েছিল আপনার ?

কিংবা

বাড়িউলী · সে কি মিঃ পল্‌ডি ? দশটাকার মনিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বক্‌শিশ !

পল্‌ডি : হেঁ হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে !

কিংবা

পল্‌ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন : ঘোড়াগুলো এরকম পাগল-পারা ছুটছে কেন ?

বন্ধু : কি আশ্চর্য, পল্‌ডি, তা-ও জানো না ! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে !

পল্‌ডি : তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন ?

এর থেকে আপনি রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, 'কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝবার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া ! আইলো সকলের পিছনে ?'

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্ কি কত্তা ! ছাখলেন, না, যেন বাঘের বাচ্চা— বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল !'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের

খানদানী গাড়োয়ান-গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহু দেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্ চতুর) নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখি নি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম-বাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ি দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে?' এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে?' এর ইংরিজি সংস্করণে আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই— মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার) দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন?'

এবারে সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিশের এসাইকে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে—জল জল, সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিশের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না—যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো ছান্ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবত পড়বে?"

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট, এদের রিপার্টি লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পূব-বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

*   *   *

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্ল ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুতসই করে যদি তাগ-মাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেরই মত বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি বৈঠক-মজলিসে ছিলেন রাসভারী প্রকৃতির। গল্প-বলার সময় কেউ কেউ অভিনয়ও যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি

পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কি ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান-বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, 'জানেন, মাস কয়েক পূবে ১১০ ডিগ্রীর গরমে যখন ঘণ্টা তিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাম-পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া রোদ্দুর, রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? "আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে ঘণ্টা-দুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।"' আমি অবধূতকে শুধোলুম, 'আপনি কি করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে। আমি আর বেশি ঘাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো ব্যাপারটার হিল্যে হয় নি।

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারি নে। প্লট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম কি দিয়ে শেষ করবো তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐয্যা, কি বলছিলুম' প্রতি দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর আছে। ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই। শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়াপরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি

মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশবার শুনে, জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছেন। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল-করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়। আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

*　　　　*　　　　*

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব গল্পকথক-সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যাণ্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর সদস্য লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এরো জানেন। কি হবে, চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালার ঐ গল্প তিনশ তেষট্টি বারের মত শুনে। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর, সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানি পড়ার বদলে শরবত পড়ার গল্পটার নম্বর ১২৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলায় পরিস্থিতিটা কি রূপ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্ছনা'ও বলতে পারেন, একদম দা-ঠাকুরের পাইস হোটেল মেসের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ির একপয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি না পড়ে শরবত পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, নম্বর '১৯৮'।

সঙ্গে সঙ্গে হোহো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে ? শুনলে ? কি রকম একখানা গল্প ছাড়লে।' আরেক জনের পেটের খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এ সব গল্প শিখে আর লাভ কি ? এদেশেও কালে বিশ্ব গল্পকথক-সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম ? ১৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প—তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায় ?

হ্যাঁ, অবশ্য, যতদিন না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে ত্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যে রকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন-বাড়িতে চপ কটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি দিয়ে ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক'॥

স্পিরিটের ভূত

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোঁসাই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা— গোঁসাই, মুখুজ্জে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুকচুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন, আর গ্রাম-সম্পর্কে-তাঁর-ভাগ্নে গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না। আজ বললেন, 'অত ডরাচ্ছিস কেন?'

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, ওটা খাবার কী প্রয়োজন? আপনি তো কখনও খান নি এতদিন বার্লিনে থেকেও। মামুরই বা কী দরকার?'

চাচা বললেন, 'ওর বাপ খেত, ঠাকুদ্দা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায়, এ-দেশে না এসেও। ও হল পাইকারী মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচী মাতাল নয়। আর, আমি কখনও খাই নি তোকে কে বললে?'

আড্ডা একসঙ্গে বললে, 'সে কী চাচা?'

এমনভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজীতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার

ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ। আসন জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন,-'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, 'এই নিয়ে আঠারটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি, না কমতি?' ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ফ্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, আহা কৈসন্ সুন্দরী,

রূপসিনী রন্দিনী,

নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুজ্জে বললে, 'চোপ্—।'

চাচা বললেন, 'ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদূখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মত রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোঁসাই বললেন, 'কিংবা দুই-ই। উদূখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন্ ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস। ভরগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, 'ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামীর আমেজ লাগিয়ে আসবে।'

আমি বললুম, অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ। রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও গতিকে রঙটা একটু "ভদ্রস্থ"

করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ মার্কা করব ? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হ'য় আমাকে সয়ে নিতে পার ; কিন্তু তোমার বাড়ির লোক ? তোমার বাবা, কাকা ?'

ব্রাখেল বললে, 'না হয় একটু বাঁদর-নাচই দেখালে।'

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রাখেল আমার যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললেন, 'অজ পাড়াগাঁ ইষ্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে ছোটবাবু, মালবাবু—অবশ্য স্থাশের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা নয়—টিকিট-বাবু, দু-চারজন তামাশা দেখনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশন বললেই হয়। ওই অজ স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

স্টেশনমাস্টার বললে, 'বাইরে গাড়ি তৈরী, এই দিকে আজ্ঞা হোক।'

বুঝলুম, ফন ব্রাখেলেরা শুধু বড়োলোক নয়, বোধ হয় এ অঞ্চলের জমিদার।

বাইরে এসে দেখি, এক প্রাচীন ফিটিং গাড়ি—কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্নিং স্যুট, মাথায় চোঙার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁপ, এডওয়ার্ডী দাড়ি, আর চোখ দুটো এবং নাকের ডগাটি সুজ্জি রায়ের চোখের মত লাল, জবাকুসুমসঙ্কাশং।

কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল—দাড়ি-গোঁপের ছাকনি দিয়ে যা বেরল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানান হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ' বলে

যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণভরে অভিসম্পাত করলুম এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু-দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গটগট করে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হন্টারওয়ালী ফিয়ারলেস্ নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশন-মাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন-বন; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাস্‌ল্। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ-দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাবড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, 'ওই আকাশে চড়তে হবে?'

কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, 'ইয়াঃ মাইন হের!' দেমাকের ঠ্যালায় তার গোঁপের ডগা দুটো আরও আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, 'এক মিনিটে পৌঁছে যাব স্যার্।' আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাট্টুর মত কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লাম্বা চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাস্‌ল্‌টার ফণা মেলেছে। কিন্তু ফণার কথা থাক্, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে যেখানে দাঁড়াল তার ওপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—'

মৌলা শুধাল, 'ভিলিকিনি মানে?'

চাচা বললেন, 'ও, ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি —সেই ভিলিকিনি থেকে ফন ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।'

তারপর আমাকে বললে, 'ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরী হয়ে নাও।'

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট, কিন্তু একটা নেভি-ব্লু স্যুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন্ রঙ নেবে যেন মনস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাত-মুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুম-টার ফেন্সি জিনিসপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক্ করে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কী ডিনার জ্যাকেট পর নি?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান।'

ফন ব্রাখেল বলেল, 'উঁহু, সেটি হচ্ছে না। এ বাড়িতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দু'জনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার উপায় নেই।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'তা তুমি এক কাজ কর। দাদার কাবার্ড-ভর্তি ডিনার জ্যাকেট, শার্ট, বো— তারই এক প্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম; ওই কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।'

আমি বললুম, 'তওবা, তওবা! তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পোঁছে তোমার ডিনার গাউনের মত ট্রেল করবে।'

বললে, 'না, না, না। সবাই কি আমার মত দিক-খেড়েঙ্গে! তুমি চটপট তৈরী হয়েও নাও, আমি চললুম।'

চাচা বললেন, 'কী আর করি, খুললুম কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট-পাতলুন ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ-ভর্তি শার্ট, কলার, বো, হীরে-বসানো সোনার শ্লীভ-লিন্‌ক্‌স্‌, আরও কত কী!

মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মত।

তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, এ বেশের সঙ্গে মাথার মধিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভাল। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের ত্যাক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মত তো দেখাচ্ছে না—তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।'

চাচার হ্যাওটা ভক্ত গোঁসাই বললে, 'চাচা এ আপনার একটা মস্ত দোষ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশী হয়ে বললেন, 'হেঁ-হেঁ, তুই তো বললি, কিন্তু ওই পুলিনটা ভাবে সে-ই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাকগে ঈভনিং ড্রেসের কালা কেষ্ট সেজে আমি শিস দিতে দিতে নামলুম নিচের তলায়—'

পুলিন শুধালে, 'স্যার, আপনাকে তো কখনও শিস দিতে শুনি নি, আপনি কি আদপেই শিস দিতে পারেন?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কী আমি নিজেই জানি নে, আমি শিস দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যান্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে

বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁজের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। না হলে আমি শিস দিতে যাব কেন? শিস কি দিয়েছিলুম আমি, শিস দিয়েছিল বকাটে স্যুটটা। তা সে কথা যাক।

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

কাস্‌লের ব্যানকুয়েট-হল্ আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে তার আর বিচিত্র কী, এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপ-ঢং দেখা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাত-ওলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজী আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন্ দি সেফ্ সাইড।

ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল্ কোন্ শতাব্দীর জানি নে, কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্যি, এঁদের রুচি আছে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে, খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্য প্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনেই দুজনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইণ্ডার (ভারতীয়) দেখেছেন. কালো ঈভনিং ড্রেসের ওপর কালো

চেহারা—গোঁসাইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো।'

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুত-ভাবে তাকালে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয় নি? কই, আমি তো একদম রেডি-মেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হাল-ফ্যাশান মাফিক তিন ডিগ্রী ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাশ চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, 'পাপা, এই হচ্ছে আমার ইণ্ডিশার আফে।'

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন 'প্‌ফুই—ছিঃ—ও রকম বলতে নেই।'

আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, 'আমি যদি বাঁদর হই, তবে ও জিরাফ।'

বলেই মনে হল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয় নি।

পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারী খুশ। বললেন, 'ডাঙ্কে—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।'

পালিশ-আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হাল্‌কা চাকতির উপর প্লেট পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দু দিকে সারি-বাঁধা অন্তত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগী খেতে হয়, কোনটা দিয়ে রোস্ট আর কোনটা দিয়েই বা সাইড ডিশ্?

আসল-খাবার পূর্বের চাট—'অর দ্য অভ্রে'র নাম দিয়েছি আমি চাট—তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুক্কার ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময়ে বাটলার দু হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুধাল, শেরি? পোর্ট? ভেরমুট? কিংবা উইস্কি সোডা?

আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। কিন্তু হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'নো, বিয়ার।'

বলেই জিভ কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনও খাই নি, তার উপরে আমি ভাল করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক—ভদ্রলোকে যদি বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা!

ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তার আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতরে অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম একটুখানি ঠোঁট ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।'

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, 'এক ধাক্কায় এক বোতল? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, 'কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা? ওরকম ঈভনিং ড্রেস পরে ব্যানকুয়েট-হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপে বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেস।'

গোঁসাই মর্মাহত হয়ে বললে, 'চাচা।'

চাচা বললেন, 'অপরাধ নিস নি গোঁসাই, ভাষা ব্যবদে আমি মাঝে মাঝে এট্টুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পয়লা গুরু ছিলেন এক ভশ্চায, তিনি শ'-কার ব'-কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক।

তখনও খেয়েছি মাত্র আড়াই চাক্তি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পদ্মার বালুচর। সেই শুধু-পেটে বিয়ার ছু মিনিট জিরিয়েই চচ্চড় করে চড়ে উঠল মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে।

এমন সময় হের ফন ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, 'বার্লিনে কী রকম পড়াশোনা হচ্ছে?'

বুঝলুম, এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ হুঁ করে গেলেই চলে। কিন্তু আমি বললুম, 'পড়াশোনা? তার আমি কী জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হৈ-চৈ করে ইয়ার-বক্শীদের সঙ্গে।'

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে স্টাটস্ বিবলিওটেকে, স্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কী? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?— পিপের ছ্যাদা দিয়ে হুইস্কি বেরচ্ছিল, ইঁদুর চুকচুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা, লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলছে, 'ওই ডাম ক্যাট্টা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়ব।'

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার এক লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিন-চার পদ খন রোস্ট টার্কীতে পৌঁছেছি, তখন দেখি অতি ধোপদুরস্ত ঈভনিং-ড্রেস-পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মুখোমুখি হয়ে

দাঁড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, 'জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইণ্ডার।' বড় নার্ভাস ধরনের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শুধু ইয়ে—' তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি শুধু রোস্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরিতে আসি।'

তারপর আমি কী বকর-বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার। কখনও বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, 'গুস্টাফ, আরও বিয়ার নিয়ে এস।'

এ কী অভদ্রতা! কিন্তু কারও মুখে এতটুকু চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়তো লক্ষ্য করি নি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি লিকার সিগার এল। আমি ভদ্রতার চূড়ান্তে পৌঁছে বললুম, 'নো লিকার বিয়ার প্লীজ।'

বাবা হেসে বললেন, 'আমাদের বিয়ার তোমার ভাল লাগাতে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়ার্ড খেললে হয় না? তুমি খেলো?'

বললুম, 'আলবত!' অথচ আমি জীবনে বিলিয়ার্ড খেলেছি মাত্র দু'দিন, কলকাতার ওয়াই. এম. সি. এ-তে। এখানকার বিলিয়ার্ড-টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশী শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন. 'গুড বাই, তোমরা খেলোগে।'

ক্লারাও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে 'গুড নাইট' বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নিচে বিরাট জলসাঘর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়ার্ড-টেবিল। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি বিয়ারের

পিপে। এত বিয়ার খায় কে? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম, 'নো শ্যাম্পেন।' আবার চলল বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'এ আবার কী কিউ দিলে?'

মার্কারের মুখে কোনও অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল না। বরঞ্চ যেন খুশী হয়েই আলমারি খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ের মত সেটা হাতে ব্যালান্স্ করে বললুম, 'এইটেই তো, বাবা, বেশ, তবে ওই পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিলে কেন?'

আমার বেয়াদবি তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢাল আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনও ঠিক ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খেলোয়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবশ্য আমি করি নি, কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভাল। আর প্রতিবারেই আমি লাড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ ও রকম লাড পায় না।

রাত কটা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনও ছটা কখনও নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভাল লীডের লাকে।

হের ফন ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, 'তোমার লাক বড় ভাল।'

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, 'লাক, না কচুর ডিম! নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক দ্যাট?'

ব্রাখেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমি অষ্টমে উঠে আরও কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দোখ মার্কার ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি আরও চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, 'তোমার মুলোর দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তেরোটায় কেউ মুলো কিনতে আসবে না।' অথচ বেচারী বুড়ো থুত্থুড়ে, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিৎকার-চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনও সেই পরিপাটি ঈভনিং ড্রেস।

আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, 'সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম।' তারপর বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্‌ফ্‌গাঙ, নিত্যি নিত্যি এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না!'

আমি বললাম, 'হুঁ হুঁ হুঁ।'

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কী স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যিকার।'

'নিত্যিকার' বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে তো ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, 'হানস পনেরো মার্ক ভলফ্‌গাঙ, তুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনই মনে পড়ল, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায় কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়, এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে

বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজিতে আবার হারলুম, এবার গেল আরও কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেণ্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হত, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরও শ দুই মার্ক 'জতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলেছে পাইকারী হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে একঝলক বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারি নে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বললেন, 'হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন, —হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—'

আবার লাক্। এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ। বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গড্‌ড্যাম লাকের দোহাই।

টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, 'তার মানে? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? ইউ অ্যাণ্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম্—'

বাপ জ্যাঠা কী বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই। কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না,

আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তুনিয়ের যত কটুকাটব্য।

এমন সময় দেখি, ক্লারা।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, 'ছোটলোক', 'মীন', এই সব অশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, 'অত চটছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন।'

বেরবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, 'সরি, সরি, প্লীজ, প্লীজ। আমাদের দোষ হয়েছে।'

তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, 'ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম 'বদঘুটে নেশার কথা কখনও শুনি নি।'

চাচা বললেন, 'যা বলেছ! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে। ঈভ্‌নিং কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি! ছি-ছি, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

আর এদেশে সবাই ভাবে ইণ্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র!

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগল। শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভাল, কারণ ভোরের আলো তখন জানলা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাব কী করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো!

তা হলে পালাই।

অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারের শব্দটি না করে স্যুটকেসটি ওইখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট। মাইলখানেক এসে ফিরে তাকালুম, নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি।

চোরের মত গাড়িতে ঢুকে বার্লিন।'

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা?'

চাচা বললেন, 'আরে, শোনই না শেষ অবধি।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা। হায়, হায়, আমি ল্যাণ্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা-গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা।

শেষটায় মরমর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম।

ক্লারা বললে, 'অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ও তো মাতলামো না, পাগলামো। কিংবা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।

'তুমি যখন দাদার স্যুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য

হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে। তারপর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোন মদ খেত না; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে, 'লেখাপড়ার সময় কোথায়? আমি তো করি হৈ-হৈ'—আমি জানতুম একদম বাজে কথা; কিন্তু দাদা হৈ-হৈ করত আর বলতেও কসুর করত না।

'শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালবাসা ছিল অগাধ।

'তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।

'কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; বাবা জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছুমাত্র আশ্চর্য কিংবা দুঃখিত হন নি।'

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস দিয়েছিল স্যুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

চাচা বললেন, 'হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।'

বাঁশী

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানীর রাজত্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছ-পালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকী-সার। বাস্। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কম্প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দা ছাড়িয়ে —খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরা মাঠ। ভোরবেলা সুজ্জিঠাকুরের টিকিটি বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুই-খানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—'চাঁদ উঠেছিল গগনে।' যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই, তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো নীল হলদে ইয়া-ইয়া ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাঁচতলা এমারত সুজ্জি-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই।' অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেটরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দী বদ্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সুদূর বাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, অর্থাৎ শাস্ত্রী-মশাই মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তাঁরা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর নরৌ নরাঃ, গজ গজৌ গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদেব দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপ-মা-খ্যাদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখান থেকে খেদিয়ে দিলে, হয় যাব ফাঁসি, নয় যাব জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারি নি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর-সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাঁজে, তারপর অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাত শো বার চক্কর খেয়ে পেয়েছে অক্কা। বুড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সে-কথা পরে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সনে। গাঁইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্যম্, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-ওয়ার্ক, ফ্রেস্কো স্টুক্কো, উড-ওয়ার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, মেদজো-টিন্ট্ আরও কত কী। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিস্ট হব। ওদিকে তো, লেখাপড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোন গতিকে

ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার-বাউণ্ডুলে না বলে, বলবে শিল্পী, কলাবৎ, আর্‌তিস্‌ৎ।

অথচ আমার বাপ-পিতামোর চোদ্দপুরুষ, কেউ কখনও গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক্‌, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কট্টর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাঁদর-গুলার ডুগডুগি শুনলে আমাদের প্রাচিত্তির করতে হয়। আমার ঠাকুর্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথম দিন ব্যালাতে ছড় টানা মাত্রই আশ্রমময় উঠল পারিত্রাহি অট্টরব। কেউ শুধালে, গরু জবাই করছে কে; কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মামদো ভূতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শুনে কী রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাত্রে কবিতা লিখলেন,

'আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

কার হাতে আর দেবেন। দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুঝিয়ে বললে, 'ভাই, ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও। বাঁশীই বাজাও; কিন্তু দোহাই আশ্রমদেবতার, আশ্রমের বাইরে রেওয়াজটা কোর।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল-গাঁয়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তোড়ি।

সাঁওতাল-গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করে মেলা 'এন্‌কোর', 'সাধু সাধু' রব কাড়লে।

সুদূর দিক্‌প্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপল সেই বাই, যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে

নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াইয়ের গেরুয়াকে কী রকম যেন মরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কী রকম যেন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি সুদূরের নেশায় এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ ঝুম করে অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথমটায় বিপদটা বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম মিনিট পাঁচেক পরে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে নীচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের ধাক্কা লেগে, কখনও বা কারও অদৃশ্য পায়ে বেমক্কা ল্যাং-খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি

দশ মিনিটে সাঁওতাল-গাঁয়ে ফেরার কথা। পনের, পঁচিশ মিনিট, আধঘন্টাটাক হয়ে গেল, গাঁয়ের কোনও পাত্তাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নামে যাকগে আকাশের সীমানা-কিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল-গ্রাম। একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না, কোন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কেমন যেন এক আর্তরব! একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফাী-ী-ী-ৎ!

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলুম। সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—ফাঁৎ, ফাঁৎ।

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মৌলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কী ভূত, না প্রেত, না ডাইনী।

হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলুম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী!

আস্তে আস্তে ফের রওয়ানা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ —প্রথমে ক্ষীণ, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে,-- ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোর চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুততর হতে থাকে— ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

আর সে কী প্রাণঘাতী, জিগরের খুন-জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কঙ্কালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীর্ঘনিশ্বাস— কখনও ধীরে ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে। একদম আমার সঙ্গে কদম কদম বাঢ়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সেঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের "কঙ্কাল" গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহর্ষির সন্তান, ভয় পান নি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কঙ্কাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্য নিত্য কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আমার গলার টুঁটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দেখি, যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে উঠছে। কিন্তু হলদে রঙের। প্যোর কোলমন্স মাস্টার্ড।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারব না।

যখন হুঁশ হল তখন গায়ে লাগল পূবের বাতাস। তারই উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ওই রকম যদি চলতে থাকি, তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা, কিংবা রেললাইনে পৌঁছবই পৌঁছব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই ফিং ফিং ফিং।

কিন্তু এবারে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢিপিতে উঠতেই দেখি—উত্তরায়ণ। তারই বারান্দায় গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিলল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকী ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু ওয়া গুরুজীকা ফতে—বেরিয়েছিল—ওরা গরজাকী ফত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে, চাপা স্বরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিং ফিং করছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোল খেয়েছে, ফিং ফিং জোরে বেজেছে। আস্তে চললে, আস্তে আস্তে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিং করে কাতর আর্তনাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি আর কলাবৎ হবার চেষ্টা করি নি।

গুরুদেব যখন গেয়েছেন—

'বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

তখন আমার কথা ভাবেন নি।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর, আঘাত করার আগে
লে আও সরাব—সও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায় রে মূর্খ। সোনা দিয়ে মাজা তোর শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে আনবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।

—ওমরখৈয়াম

ত্রিমূর্তি

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোঁসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোঁসাই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কি রকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না ছ্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ এক-একটা তিমি মাছের সাইজ; আর তিমি মাছ—'ও সে দেখিনি। তবে বোধ হয়, ভাবং বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টটাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রসুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাস-মাস্ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইণ্ডিসে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতোভাবে ওদের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল ট্রায়েঙ্গল!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সূয্যি রায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পইপই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবিনি। ডি, ই দ্য; টি, আর, ও পি ত্রো—পি সাইলেণ্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বালিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগলো।

আড্ডায় লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেনরে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য। তখন কি বলিস্? 'ভাগ্নে বৌ দুয়ারে—কোনা কেটে ফালদি যা।' ববক্ষ সুয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডাম্‌কে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্য ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-ছলো-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস্ থাকলে?'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস্।'

চাচা বললেন, 'হু। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির দল। জর্মান, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিল্‌ক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যেরকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-ওলা নামলে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব-উন্‌ট্‌-হাল্‌প—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অঁ পো্যা আঁসিয়েন্‌—একটুখানি এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্‌ ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে 'ক্যাস্‌ কিল্‌ দি—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'ম দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথাড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ এক সঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যেরকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোড়ে। কি ব্যাপার! দেখ্‌তো না ভাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোঁদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখদুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনে ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌গে। আমার বয়স হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দু'জনাই চুপচাপ। আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্ মসিয়ো কোন্ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্ হ্যার, কোন ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্ মিসিস কোন্ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নল্ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হ'তে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দু'জনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একে অন্যকে গম্ভীরভাবে স্টিফ বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠাটা চালাকি করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই ছুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী এলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্‌ল্!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ!'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসান্‌ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাকা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সকলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান্ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা। আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভালো মানুষ নিগ্রো পাত্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলাবদলীর প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি

প্রকারে ? বহু বাক্‌-বিতণ্ডার পর স্থির হলো, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠারো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্‌নেস। বমি আর বমি। প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তারপরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিকে আছি আর কি ? খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে। মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরিফিরি করছে'। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই

যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'কেবিন'।' আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দু'জনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দু'জনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্‌।'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডার সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্স্‌ বুঝিস নে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে ফেলিসিতাসিয়োঁ, মসিয়ো, কেউ বলে, কন্‌গ্রাচুলেশনস, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে— ছুচ্ছাই, এ-সব কি? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল। ভিভ্‌ ল্য বাঁগাল। লং লিভ বেঙল!'

আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতে নি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

'খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়।'

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

বসন্ত-প্রাতে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথঘাট ভরে!
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ওমা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

—শ্রমণ রিয়োকোয়ান

বেলতলাতে দু'বার

বার্লিন শহরে 'হিন্দুস্থান হৌসের' আড্ডা সেদিন জমিজমি করে জমছিল না। নাৎসিদের প্রতাপ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশী হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজের পিঠে দু'চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ-আড্ডার কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু'একটা মূর্খ নাৎসি নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক-বাঁকা নীল-চোখো কাশ্মীরীকে তারা নাকি দু'একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে।

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা এ-সব বাবদে নাৎসিদের চেয়েও অসহিষ্ণু। বলল, 'আমরা যে পরাধীন সে-কথা সবাই জানে। তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া ?' এক ব্যাটা নাৎসি সেদিন আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল, 'তোমরা তো পরাধীন, তোমরা এসব নিয়ে ফপরদালালি কর কেন ?' নাৎসিদের তর্ক করার কায়দা অদ্ভুত।'

পুলিন সরকার বলল, 'তা তুই বললি না কেন, পরাধীন বলেই তো বাওয়া, ভারতবর্ষে কলকব্জা বেচে আর ইনসিওরেন্স কোম্পানী খুলে দু' পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো। ভারতবর্ষের লোক তো আর হটেন্‌টট্‌ নয় যে, স্বরাজ পেলেও কল-কব্জা বানাতে পারবে না ? জানিস, সুইটজার-ল্যাণ্ডে এখন জাপানী ঘড়ি বিক্‌কিরি হয়।'

বিয়ারের ভিতর থেকে সূয্যি রায় বললেন,

'নাই তাই খাচ্ছো,
থাকলে কোথা পেতে ?'
কহেন কবি কালিদাস
'পথে যেতে যেতে।'

কাটা-ঘায়ের ঘাতে যে মাছিগুলো পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছিল তারাও তাই নিয়ে গরুটাকে কটু-কাটব্য করে নি। নাৎসিদের বুদ্ধি ঐ রকমেরই। যে হাত খাবার দিচ্ছে সেইটেকেই কামড়ায়। নাৎসিদের তুলনায় ইংরেজ সম্বন্ধীরা ঘুঘু—ভারতবর্ষের পরাধীনতাটার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন বাড়ির ছোট বউ। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় বটে কিন্তু তিনি যে আছেন সে-কথাটা কথাবার্তায় চালচলনে আকসারই অস্বীকার ক'রে যায়।'

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। তাঁর ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই জিজ্ঞেস করল, 'চাচা যে রা কাড়ছেন না ?'

চাচা চোখ না খুলেই বললেন, 'আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

সবাই অবাক। গোঁসাই জিজ্ঞেস করল, 'সে কি কথা ? নাৎসিরা তো দাবড়াতে আরম্ভ করেছে মাত্র সেদিন। এর মাঝে কিছু একটা হলে আমরা খবর পেতুম।'

কথাটা সত্য। চাচার গলাবন্ধ কোট, শ্যামবর্ণ চেহারা, আর রবিঠাকুরী বাবরী বার্লিন শহরের হাইকোর্ট। যে দেখে নি তার বাড়ি পদ্মার হে-পারে। চাচার উপর চোটপাট হলে একটা আন্তর্জাতিক না হোক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

চাচা বললেন, 'তোরা তো দেখছিস নাৎসিদের দ্বিজত্ব। তাদের পয়লা জনম হয়েছিল মিউনিকে। আমি তখন—'

জব্বলপুরের শ্রীধর মুখুয্যে অভিমান ভরে বলল, 'চাচা, আপনি কি আমাদের এতই বাঙাল ঠাওরালেন যে আমরা পুচ্‌শের (Putsch) খবরটা পর্যন্ত জানি নে ?'

চাচা বললেন, 'এহ বাহ্য, আমি তারও আগেকার কথা বলছি। এই ভুশুণ্ডি সূয্যি রায় আর আমি তখন মিউনিকে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম। মিউনিক বললে ঠিক কথা বলা হল না। আমরা

থাকতুম মিউনিক থেকে মাইল পনরো দূরে, ছোট্ট একটা গ্রামে—ডে'ল প্যাসেঞ্জরি করলে সব দেশেই পয়সা বাঁচে। আমি থাকতুম এক মুদির বাড়িতে। নিচের তলায় দোকান, উপরে তিন ছেলে এক মেয়ে, আর আমাকে নিয়ে মুদির সংসার।

মুদির সংসারটির দুটি মহৎ গুণ ছিল—কাচ্চাবাচ্চা বাপ মা সকলেরই ঠাট্টা-মস্করার রসবোধ ছিল প্রচুর আর ওস্তাদী সঙ্গীতের নামে তারা অজ্ঞান। বড় ছেলে অস্কার বাজাত বেয়ালা, মেয়ে করতাল-ঢোল, বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবের্ট চেল্লো। কাজকর্ম সেরে দু'দণ্ড ফুসরত পেলেই কনসার্ট—কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-মস্করা।

কিন্তু এদের মধ্যে আসল গুণী ছিল অস্কার। তবে তার গুণের সন্ধান পেতে আমার বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল—কারণ অস্কারকে পাওয়া যেত দুই অবস্থায়। হয় টং মাতাল, নয় মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধা। তখন সে প্রধানত আমাকে লক্ষ্য করেই বলত,

'ডু ইণ্ডার, ওরে ভারতবাসী কালা শয়তান, তোরা যে মদ খাস্ নে সেইটেই তোদের একমাত্র গুণ। তোর সঙ্গে থেকে থেকে আর কাল রাত্রির বাইশ গেলাসের পর—'

মেয়ে মারিয়া আমাকে বলল, 'বাইশ না বিয়াল্লিশ জানল কি করে? পনরোর পর তো ও আর হিসেব রাখতে পারে না।'

মা বলল, 'তাই হবে। কাল রাত্রে চারটের সময় অস্কার বাড়ি ফিরে তো হুড়হুড় করে সব বিয়ার গলাতে আঙুল দিয়ে বের করে নিচ্ছিল। বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল তাতে কোনো ফাঁকি নেই তো। বমি করছিল বোধহয় মেপে দেখবার জন্য।'

অস্কার বলল, 'ওসব কথায় কান দিয়ো না হে ইণ্ডার (ভারতীয়)। দরকারও আর নেই। আমি এই সর্বজনসমক্ষে মা-মেরির দিব্যি কেটে বললুম, আর কক্খনো মদ স্পর্শ করব না। মদ মানুষকে পরের

দিন কি রকম বেকাবু করে ফেলে এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল। বাপ রে বাপ, মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে।'

ভিজে পট্টিতেও আর কুলোল না। অস্কার কল খুলে মাথাটি নিচে ধরল।

সেখান থেকেই জলেব শব্দ ডুবিয়ে অস্কার হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে বিয়ারে ফাঁকি দিয়ে পয়সা মারবে কে শুনি? হুঁঃ। বক্সিং-এর পয়লা প্রাইজের কথা কি মদওয়ালা ভুলে গিয়েছে? তাব হোটেলের বাগানেই তো, বাবা, ফাইনালটা হল। ব্যাটার নাকটা এমনিতেই থ্যাবড়া, আমার বাঁ-হাতের একখানা সরেস আণ্ডার-কাট খেলে সে-নাক মিউনিক-বার্লিন সদর রাস্তার মত ফেলেট্ হয়ে যাবে না?'

কথাটা ঠিক। বিয়ারওয়ালা বরঞ্চ ইনকামটেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে—'আভেমারিয়া' মন্ত্র কমিয়ে সমিয়ে ভগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেঘরে সে দেয়ই, না হলে সময় মত দোকান খুলবে কি করে?—কিন্তু বিয়ার নিয়ে অস্কারের সঙ্গে মস্করা ফস করে কেউ করতে যাবে না।

ঢকঢক করে এক গেলাস লেবুর শরবত খেয়ে অস্কার বলল, 'মাথার ভিতর যেন অ্যারোপ্ল্যানের প্রপেলার চলছে, চোখের সামনে দেখছি গোলাপী হাতী সারে সারে চলছে, জিবখানা যেন তালুর সঙ্গে ইষ্ক্রু মারা হয়ে গিয়েছে, কানে শুনছি, মা যেন বাবাকে ঠ্যাঙাচ্ছে।'

মুদি বলল, 'ভাল হোক মন্দ হোক, আমার তো একটা আছে, তুই তো তাও জোটাতে পারলি নে।'

অস্কার কান না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আর বিয়ার না। মা-মেরি সাক্ষী, পীর রেমিগিয়ুস সাক্ষী, কালা শয়তান ইওার সাক্ষী, আর বিয়ার না।'

অস্কারকে সকালবেলা যে-কোনো মদ্য-নিবারণী সভার বড়কর্তা

বানিয়ে দেওয়া যায়। সন্ধ্যের সময় বিয়ারের জন্য সে আলকাপোনের ডাকাতদলের সর্দারী করতে প্রস্তুত। আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম, 'অস্কার, এই নিয়ে তুমি সাতাশী বার মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করেছ।'

অস্কার বলল, 'যাঃ! তুই সাতাশী পর্যন্ত গুনতেই পারিস নে! ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকবা সাতাশী। তুই তো তাদেরই একজন। ওখানে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এদেশে এসেছিস। তুই সাতাশীতে ঘুলিয়ে ফেলেছিস।'

মুদির মা বলল, 'অস্কার চাকরি পেয়েছে আঠারো বছর বয়সে। সেই থেকে প্রতি রাত্রেই বিয়ার, ফি সকাল মদ ছাড়ার শপথ। এখন তার বয়স বাইশ। সাতাশীবার ভুল বলা হল।'

অস্কার বলল, 'ঐ যাঃ! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম আজ আমাদের কারখানার সালতামামী পরব—বিয়ার পার্টি। চাকরির কথায় মনে পড়ল! কিন্তু না, না, না, আর বিয়ার না। দেখো, ইণ্ডার, আজ যদি পার্টির কোনো ব্যাটা আসে তবে তুমি ভারতীয় কায়দায় তাকে নরবলি দেবে।'

চাচা বললেন, 'আমি আজও বুঝতে পারি নে অস্কার এই পট্টি-বাঁধা মাথা নিয়ে কি করে প্রেসিশন মেশিনারির কাজ করত। মদ খেলে তো লোকের হাত কাঁপে, চোখের সামনে গোলাপী হাতী দেখে। অস্কার এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ তা হলে দেখতই বা কি করে আর বানাতোই বা কি কৌশলে? এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারত বলে তাকে মাত্র ছ'ঘণ্টা কারখানায় খাটতে হত। মাইনেও পেত কয়েক তাড়া নোট। তাই দিয়ে খেত বিয়ার আর করত দান খয়রাত। দ্বিতীয়টা হরবকত। মৌজে থাকলে তো কথাই নেই, পট্টিবাঁধা অবস্থায় ও মোটর-সাইকেল থেকে নেবে বুড়ী দেশলাইওয়ালীর কাছ থেকে একটা দেশলাই কিনে এক ডজনের পয়সা দিত।

অস্কার ছিল পাঁড় নাৎসি। আমাকে বলত, 'এ সব ভিখিরি আতুরকে কেন যে সরকার গুলি করে মারে না'একথাটা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নে। সমস্ত দেশের কপালে আছে তো কুল্লে তিন মুঠো গম। তারই অর্ধেক খেয়ে ফেললে এ বুড়ী, ও কানী, সে খোঁড়া। সোমত্ত জোয়ানেরা খাবে কি, দেশ গড়বে কি দিয়ে ? স্লেজকে যখন নেকড়ে তাড়া করে তখন দুটো দুব্‌লা বাচ্চা ফেলে দিয়ে বাঁচাতে হয় তিনটে তাগড়াকে। সব কটাকে বাঁচাতে গেলে একটাকেও বাঁচানো যায় না। কথাটা এত সোজা যে কেউ স্বীকার করবে না, পাছে লোকে ভাবে লোকটা যখন এত সোজা কথা কয় তখন সে নিশ্চয়ই হাবা।'

আমি বললুম, 'তিনটেকে বাঁচাতে গিয়ে দুটোকে নেকড়ের মুখে দিয়ে যদি অমানুষ হতে হয় তবে নাই বাঁচল একটাও।'

অস্কার যেন ভয়ঙ্কর বেদনা পেয়েছে সে রকম মুখ করে বললে, 'বললি ? তুইও বললি ? তুই না এসেছিস এদেশে পড়াশোনা করতে। এদেশের পণ্ডিতদের জুড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই তুই এখানে এসেছিস। এ পণ্ডিতের জাতটা মরে যাক্ এই বুঝি তোর ইচ্ছে ? বল দিকি নি বুকে হাত দিয়ে, এই জর্মন জাতটা মরে গেলে পৃথিবীটা চালাবে কে ? পণ্ডিত, কবি, বীর এ জাতে যেমন জন্মেছে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। তোমার ওসব লেকচার আমি ঢেরঢের শুনেছি।'

অস্কার মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। তোকে এসব শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, তুই মুসলমান, তোরা কখনো ধর্ম বদলাস নে, যা আছে তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকিস। চ, একটা বিয়ার খাবি ?'

আমি পিনিয়ন থেকে নেমে বললাম, 'গুড বাই। আর দেখো তুমি সোজা বাড়ি যেয়ো।' আমি লোকাল ধরব।'

অস্কার বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমাকে তো আর নিত্যি নিত্যি

আমি লিফ্‌ট্‌ দিতে পারি নে। কারখানায় পরীরা সব ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছে আমার উপর, কাউকে লিফ্‌ট্‌ দিই নে বলে। প্রেমট্রেম সব বন্ধ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'এ কথাটা এত দিন বলো নি কেন? আমি তোমাকে পইপই করে বারণ করি নি আমার কখন ক্লাস শেষ হয় না হয় তার ঠিক নেই, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

অস্কার বলল, 'তোমার জন্য আমি আর অপেক্ষা করলুম কবে? সামনের শরাবখানায় ঢুকি এক গেলাস বিয়ারের তরে। জানালা দিয়ে যদি দেখা যায় তুমি বেরিয়ে আসছ তাহলে কি তোমার দিকে তাকানোটাও বারণ? বেড়ালটাও তো কাইজারের দিকে তাকায়, তাই বলে কি কাইজার তার গর্দান নেন নাকি?'

চাচা বললেন, 'অস্কারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আর ঐ ছিল তার অদ্ভুত পরোপকার করার পদ্ধতি। 'ভিখিরিটাকে তিনটে মার্ক দিলে কেন?' অস্কার বলবে, 'ব্যাটা বেহেড মাতাল, তিন মার্কে টং নেশা করে গাড়ি চাপা হয়ে মরবে এই আশায়।' 'আমাকে নিত্যি নিত্যি লিফ্‌ট্‌ দেবার জন্য তুমি অপেক্ষা করো কেন?' 'সে কি কথা? আমি তো বিয়ার খেতে শরাবখানায় ঢুকেছিলুম।' 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছো কেন?' 'তাই দিয়ে বন্দুক পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তারপর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' আমি একদিন বলেছিলুম, 'মিশনারিরা যে আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে যায় সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' অস্কার বলল, 'তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারী নিগ্রোরা খাবে কি? মিশনারির মাংস উপাদেয় খাদ্য!'

চাচা বললেন, 'কিন্তু এসব হাইজাম্প লঙ্‌জাম্প শুধু মুখে মুখে। অস্কার নাৎসি আন্দোলনের বেশ বড় ধরনের কর্তা আর নাৎসিদের নিয়ে যতই রসিকতা করুক না কেন, আর কেউ কিছু বললে তাকে মার মার করে তাড়া লাগাত। আমার সঙ্গে এক বৎসর ধরে যে এত

বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সেইটি পর্যন্ত সে একদিন অকাতরে বিসর্জন দিল ঐ নাৎসিদের সম্বন্ধে আমি আমার রায় জাহির করেছিলুম বলে।

রান্নাঘরে সকালবেলা সবাই জমায়েত। সেদিন ছিল রবিবার—সপ্তাহে ঐ একটি মাত্র দিন আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতুম, আর ছ'দিন যে যার সুবিধে মত।

মেয়ে মারিয়া পাঁচজনের উপকারার্থে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। অস্কার মাথার ভিজে পট্টি বাঁধছিল আর আপন মনে মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেকে বোঝাচ্ছিল, বিয়ার খাওয়া বড় খারাপ। মারিয়া হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ খবরটা মন দিয়ে শুনুন, হের ডক্টর। 'পাটেনকির্খেনে হৈহৈ রৈরৈ, নাৎসি গুণ্ডা কর্তৃক ইহুদিনী আক্রান্ত। প্রকাশ, ইহুদিনী রাস্তায় নাৎসি পতাকা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। নাৎসিরা তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পতাকার সামনে মাথা নিচু করতে আদেশ করে। সে তখনো নারাজী প্রকাশ করাতে নাৎসিরা তাকে মার লাগায়। পুলিশ এসে পড়ায় নাৎসিরা পালিয়ে যায়। তদন্ত চলছে।''

চাচা বললেন, 'আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, নাৎসি গুণ্ডারা কি করে না-করে আমার তাতে কি?'

অস্কার আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'জাতির পতাকার সম্মান যারা বাঁচাতে চায় তারা গুণ্ডা?'

আমি কিছু বলার আগেই বুড়ো বাপ বলল, 'ওটা জাতির পতাকা হল কি করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।'

আমি বললুম, 'ঠিক,—এবং জাতীয় পতাকাকে কেউ অবহেলা করলে তাকে সাজা দেবার জন্য পুলিশ রয়েছে, আইন আদালত রয়েছে। বিশেষ করে একটা মেয়েকে ধরে যখন পাঁচটা ষাঁড়ে মিলে ঠ্যাঙায় তখন সেটা গুণ্ডামি না হলে গুণ্ডামি আর কাকে বলে?'

অস্কার আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি তাহলে ইহুদিদের পক্ষে?'

আমি বললুম, 'অস্কার, অত সিরিয়স হচ্ছ কেন ? আমি ইহুদিদের পক্ষে না বিপক্ষে সে প্রশ্ন তো অবান্তর।'

অস্কার বলল, 'প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদিরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।'

চাচা বললেন, 'এর পর আমার আর কোনো কথা না বললেও চলত। কিন্তু মানুষ তো আর সব সময় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ওঠা-বসা করে না, আর হয় তো অস্কার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল, কোনো একটা জুতসই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তো আর্য জাতি রয়েছে এবং তারা জর্মনদের চেয়ে বেশী খানদানী এবং কুলীন। আর্যদের প্রাচীনতম সৃষ্টি চতুর্বেদ ভারতবর্ষেই বেঁচে আছে। গ্রীস রোমে যা আছে তার বয়স বেদের হাঁটুর বয়সেরও কম। জর্মনির ফ্রান্সের তো কথাই ওঠে না—পরশু দিনের সব চ্যাংড়ার পাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় তত্ত্বকথা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। আমাদের দেশে বর্ণসঙ্কর সবচেয়ে কম হয়েছে কাশ্মীরে—আর ভারতীয় সভ্যতায় কাশ্মীরীদের দান ট্যাকে গুঁজে রাখা যায়। এবং আমার বিশ্বাস যে সব গুণী জর্মনিকে বড় করে তুলেছেন তাঁদের অনেকেই খাঁটি আর্য নন।'

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে অস্কার হুঙ্কার তুলে বলল, 'আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সব বাস্টার্ড ?'

চাচা বললেন, 'আমি তো অবাক। কিন্তু ততক্ষণে আমার সং-বুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিছু না বলে চুপ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন, সেই অবসরে গোলাম মৌলা বলল,

'আমার সঙ্গেও ঠিক এইরকম ধারাই তর্ক হয়েছিল কিন্তু আমি তো ভারতীয় সভ্যতার অতশত জানি নে তাই ওরকম টায় টায় তুলনায় দিয়ে তর্ক করতে পারি নি! কিন্তু নাৎসিরা রাগ দেখায় একই ধরনের।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি প্রয়োজন ছিল তর্ক করার? বিশেষ করে যখন জানি, যত বড় সত্য কথাই হোক মানুষ আপন কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য সেটাকেও বিসর্জন দেয়। তার উপর অস্কার জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? মানুষটা ভালো, তর্ক করে আনাড়ীর মত, আর আগেও তো বলেছি তার হাই-জাম্প, লঙ্‌জাম্প তো শুধু মুখেই।'

আমি আর অস্কার বাড়ির সকলের পয়লা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরতুম। পর দিন খেতে বসে দেখি অস্কার নেই। র‍্যাকে তার বর্ষাতি আর হ্যাটও নেই। বুঝলুম আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। মনে কি রকম খটকা লাগল। দু'দিনের ভিতরই কিন্তু ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে গেল—অস্কার আমাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুনলুম মুদি আর তার মা আমার পক্ষ নিয়ে অস্কারকে ধমক দিয়েছেন। অস্কার কোনো উত্তর দেয় নি কিন্তু আমি রান্নাঘরে থাকলে সেখানে আসে না।

মহা বিপদগ্রস্ত হলুম। বাড়ির বড় ছেলে আমার সঙ্গে মন-কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, আর সবাই সে সম্বন্ধে সচেতন, অষ্টপ্রহর অস্বস্তিভাব, বুড়োবুড়ী আমার দিকে সব সময় কি রকম যেন মাপ-চাই ভাবে তাকান—মরুক গে, কি হবে এখানে থেকে।

বুড়োবুড়ী তো কেঁদেই ফেললেন। মারিয়া আমার কাছে ইংরিজী পড়ত। সে দেখি জিনিসপত্র প্যাক করছে; বলল, 'চললুম কিছুদিনের জন্য মাসীর বাড়ি।' দুসরা ছেলে হবেট কথা কইত কম। আমাকে ম্যুনিকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল,

'আশ্চর্য, অস্কারের মত সহৃদয় লোক নাৎসিদের পাল্লায় পড়ে কি রকম অদ্ভুত হয়ে গেল দেখলেন ?' আমি আর কি বলব।'

চাচা বললেন, 'তারপর ছ'মাস কেটে গিয়েছে। বান্ধব বর্জন সব সময়ই পীড়াদায়ক—সে বর্জন ইচ্ছায় করো আরো অনিচ্ছাই ঘটুক। তার উপর বড় শহরে মানুষ যে রকম নিঃসঙ্গ অনুভব করে তার সঙ্গে গ্রামের নির্জনতার তুলনা হয় না। গ্রামের নিত্যকার ডালভাত অরুচি এনে দেয় সত্যি, তবু সেটা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর পাঁচজনের শেরি-শ্যাম্পেন খাওয়া দেখার চেয়ে অনেক ভালো। দিনের ভিতর তাই অন্তত পঞ্চাশবার 'দুত্তোর ছাই' বলতুম আর বুড়োবুড়ীর কাছে ফিরে যাওয়া যায় কি না ভাবতুম। কিন্তু জানো তো, বড় শহরে স্থান যোগাড় করা যেমন কঠিন, সেখান থেকে বেরনো তার চেয়েও কঠিন।

করে করে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। একদিন বাসায় ফিরে দেখি বুড়োবুড়ী আর মারিয়া আমার বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কি ব্যাপার? রোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা। আমাদের যেমন ঈদ দুর্গোৎসবের সময় আত্মীয়স্বজন দেশের বাড়িতে জড়ো হয় এদের বাৎসরিক মেলার সময়ও এ রেওয়াজ। বুড়োবুড়ী, মারিয়া তাই আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।

আমার মনের ভিতর কি খেলে গেল সেইটে যেন বুঝতে পেরেই মারিয়া বলল, 'অস্কারের সঙ্গে এ ক'দিন আপনার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। ছুটি নিয়ে এ ক'দিন সে অষ্টপ্রহর বিয়ার খায়। আপনাকে দেখলেও চিনতে পারবে না।'

বুড়ী বললেন, 'অস্কারকে একটা সুযোগ দিন আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার। মেলার সময় তাই তো আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়।'

মেলার পরব সব দেশে একই রকম। তিন মিনিট নাগরদোলায় চক্কর খেয়ে নিলে, ঝপ্ করে দুটো পানের খিলি মুখে পুরলে (দেশভেদে চকলেট), দুটো সস্তা পুতুল কিনলে, গণৎকারের সামনে

হাত পাতলে, না হয় ইয়ারদের সঙ্গে গোট পাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসলে (দেশভেদে ফষ্টিনষ্টি করলে) অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যে ঘন ঘন পট পরিবর্তন সম্ভব হয় না সেইটে মেলার সময় সুদে আসলে তুলে নেওয়া। যে মেলা যত বেশী মনের ভোল ফেরাবার পাঁচমেশালী দিতে পারে সে-মেলার জৌলুস তত বেশী। তাই বুঝতে পারছ, বড় শহরে কেন মেলা জমে না। যেখানে মানুষ বারো মাস মুখোশ পরে থাকে সেখানে বউরূপী কক্ষে পাবে কেন ?

তবে দেশের মেলার সঙ্গে এদেশের মেলার একটা বড় তফাত রয়েছে। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেলা যখন ঝিমিয়ে আসে তখন দেশে শুরু হয়, যাত্রা-গান কিংবা কবির লড়াই। এদেশে শুরু হয় মদ আর নাচ। ছোটখাটো গ্রামে তো প্রায় অলঙ্ঘ্য রেওয়াজ প্রত্যেক মদের আড্ডায় অন্তত একবার ঢুকে এক গেলাস বিয়ার খাওয়ার। কারো দোকান কুট্ করা চলবে না, তা ইতিমধ্যে তুমি টং হয়ে গিয়ে থাকো আর নাই থাকো।

আমরা যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতায় সুখ পাই, জর্মনরা তেমনি আইন মেনে সুখ পায়। মুদি মুদিবউ তাই আমাকে নিয়ে এই নিয়ম প্রতিপালন করে করে শেষটায় ঢুকলেন তাঁদেরই বাড়ির পাশের গ্রামের সব চেয়ে বড় শরাবখানায়। রাত তখন এগারোটা হবে। ডান্স হলের যা সাইজ তাতে ছ' পাঁচখানা চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। আশপাশের দশখানা গ্রামের ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ী ধেইধেই করে নাচছে, আর শ্যাম্পেন-ওয়াইন যা বইছে তাতে সমস্ত গ্রামখানাকে সম্বৎসর মজিয়ে রেখে আচার বানানো যায়। দেশলাই ঠুকতে ভয় হয় পাছে হাওয়ার এলকহলে আগুন ধরে যায়, সিগার সিগারেটের ধুঁয়ো দেখে মনে হয় দেশের গোয়ালঘরের মশা তাড়ানো হচ্ছে।

বুড়োবুড়ী পাড়ার মুরুব্বি। কাজেই তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।

বুড়োবুড়ী আইন মেনে এক চক্কর নেচে নিলেন। বয়স হয়েছে, অল্পেই হাঁপিয়ে পড়েন। তবু পায়ের চিকন কাজ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারলুম, এঁদের যৌবনে এঁরা আজকের দিনের ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে ঢের ভালো নেচেছেন। আর মারিয়ার তো পো' বারো। সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে যে লোফালুফি লেগে যাবে, সে-কথা নাচের মজলিসে না এসেই বলা যায়।

ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছে। মজলিস গুলজার। সবাই মৌজে। তখনো লোকজন আসছে—এত লোকের যে কোথায় জায়গা হচ্ছে খোদায় মালুম, আল্লাই জানেন। এমন সময় একজোড়া কপোত-কপোতী আমাদেরই টেবিলের পাশে এসে জায়গার সন্ধানে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তখন আর সত্যি একখানা চেয়ারও খালি নেই। বুড়োবুড়ী তাদের ডেকে বললেন, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আপনারা আমাদের জায়গায় বসতে পারেন।' আমি উঠে দাঁড়ালুম। বুড়ী বললেন, 'সে কি কথা? আপনি থাকবেন। না হলে মারিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসবে কে?' আমার বাড়ি যাবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এরপর তো আর আপত্তি জানানো যায় না। জর্মনি মধ্যযুগের প্রায় সব বর্বরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু শক্তসমর্থ মেয়েরও রাত্রে রাস্তায় একা বেরুতে নেই এ বর্বরতাটা কেন ছাড়তে পারে না বুঝে ওঠা ভার।

কপোত-কপোতী চেয়ার দুটো পেয়ে বেঁচে গেল। কপোতীটি দেখতে ভালোই, মারিয়ার সঙ্গে বেশ যেন খাপ খেয়ে গেল। আমি তাদের মধ্যিখানে বসেছিলুম—আহা, যেন দুটি গোলাপের মাঝখানে কাঁটাটি।'

চাচার কথায় বাধা দিয়ে গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আত্মনিন্দা করবেন না। বরঞ্চ বলুন, দুটো কাঁটার মাঝখানের গোলাপটি।

আর কিছু না হোক সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে ইণ্ডার হিসেবে নিশ্চয়ই আপনাকে মাইডিয়ার-মাইডিয়ার দেখাচ্ছিল।'

চাচা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। ঐ বিদেশী চেহারার যে চটক থাকে তাই নিয়ে বাধল ফ্যাসাদ।

নাচের মজলিসে, বিশেষ করে একই টেবিলে তো আর ব্যাকরণসম্মতপদ্ধতিতে ইনট্রডাকশন্ করে দেবার রেওয়াজ নেই। কপোতীটি বিনা আড়ম্বরে শুধালো, 'আপনি কোন্ দেশের লোক ?' উত্তর দিলুম। তারপর এটা, ওটা, সেটা এমন কি ফষ্টিটা নষ্টিটা, অবশ্যি সন্তর্পণে, যেন ফুলদানির ফুলের ভিতর দিয়ে—থ্রু দি ফ্লাওয়ার্স।

ওদিকে দেখি কপোতটি এ জিনিসটা আদপেই পছন্দ করছে না।

আমি ভাবলুম, কাজ কি হাঙ্গামা বাড়িয়ে। দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিলুম না, যেন শুনতে পাই নি। কিন্তু মারিয়াটা ঘড়েল মেয়ে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট্ করে আর নষ্টামির ভূত চেপেছে তার ঘাড়ে, হয়ত শ্যাম্পেনও তার জন্য খানিকটা দায়ী। সে আরম্ভ করল মেয়েটাকে উসকাতে। বলল, জানেন, ইনি আমার দাদা হন।'

মেয়েটি বললে, 'তা কি করে হয়। ওঁর রঙ বাদামী, চুল কালো, উনি তো ইণ্ডার।'

মারিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'ও তো। উনি যখন জন্মান মা বাবা তখন কলকাতার জর্মন কনস্লেটে কর্ম করতেন। কলকাতার লোক বাঙলা ভাষায় কথা কয়। দাদাকে জিজ্ঞেস করুন উনি বাঙলা জানেন কিনা।'

মেয়েটি হেসে কুটি কুটি। বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর জর্মন বলাতে কেমন যেন একটু বিদেশী গোলাপের খুশবাই রয়েছে।' মেরেছে। বিদেশী ওঁচা অ্যাকসেন্ট হয়ে দাঁড়ালো 'গোলাপী খুশবাই'।'

চাচা বললেন, 'আমি মারিয়াকে দিলুম ধমক। দিয়ে করলুম ভুল। বোঝা উচিত ছিল মারিয়ার স্কন্ধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত ভ্যাং

ড্যাং করে নাচছে। শ্যাম্পেনকে ঝাঁকুনি দিলে তার বজ্‌বজ্‌ বাড়ে বই কমে না। মারিয়া মরমিয়া সুরে কপোতীর কাছে মাথা নিয়ে গিয়ে বলল, 'আর উনি এ্যাসা খাসা নাচতে পারেন। আমাদেরই ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচ—আর তার উপর থাকে ভারতীয় জরির কাজ। আইন, ৎস্বুয়াই, দ্রাই,—আইন, ৎস্বুয়াই, দ্রাই,—তার সঙ্গে ধা, ধিন, না ; ধা, তিন, না ; ডাডরা ? না ?''

চাচা বললেন, 'পাঁচপীরের কসম, আমার বাপ ঠাকুর্দা চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো নাচে নি। মুখে গরম আলু পড়াতে হয় তো নেচেছে কিন্তু সে তো ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নয়। মেয়েটাও বেহায়ার একশেষ। মারিয়াকে বলল, 'তা উনি যে নাচতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কি ? কি রকম যেন সাপের মত শরীর।' বলে চোখ দিয়ে যেন আমার গায়ে এক দফা হাত বুলিয়ে নিল।'

চাচা বললেন, 'ওঃ! এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ওদিকে ছেলেটাও চটে উঠেছে। আর চটবে নাই বা কেন ? বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে নাচের মজলিসে ফূর্তি করতে। সে যদি আরেকটা মদ্দার সঙ্গে জমে যায় তবে কার না রাগ হয় ? কপোত দেখি বাজ-পাখির মূর্তি ধরতে আরম্ভ করছে। তখন তাকিয়ে দেখি তার কোটে লাগানো রয়েছে নাৎসি পার্টির মেম্বারশিপের নিশান। ভারী অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম।

মারিয়া তখন তার-সপ্তকের পঞ্চমে। শেষ বাণ হানলো, 'একটু নাচুন না, হের ডক্টর।'

আমাদের দেশে যেমন বাচ্চা মেয়ের নাম 'পেঁচির মা', 'ঘেঁচির মা' হয়, আপন বাচ্চা জন্মাবার বহু পূর্বে, ম্যুনিক অঞ্চলে তেমনি ডক্টরেট প্রসব করার পূর্বেই পোয়াতী অবস্থাতেই আত্মীয়-স্বজন ডাকতে আরম্ভ করে, 'হের ডক্টর।' আমার তখনো ডক্টরেট পাওয়ার ঢের বাকী, কিন্তু আত্মজনের নেকনজরে আমি য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হার্ড-বয়ল্‌ড্‌ হের ডক্টর হয়ে গিয়েছিলুম। মারিয়ার

অবশ্য এই বেমোকায় 'হের ডক্টর' বলার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যে অজ পাড়াগাঁয়ের মেলাতে বসে থাকলেই মানুষ কিছু কামার-চামার হতে বাধ্য নয়—আমি রীতিমত খানদানী মনিষ্যি, 'হের ডক্টর।' বাঙলা কথা।

মেয়েটি তখন কাতর হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলল, 'হে—র—ড—ক্—ট—র।'

চাচা বললেন, 'আমি মনে মনে বললুম 'দুত্তোর তোর হের ডক্টর, আর দুত্তোর তোর এই মারিয়াটা।' মুখে বললুম, 'মারিয়া, আমি এখখুনি আসছি।' বলে, দিলুম চম্পট।'

চাচা বললেন, 'তোরা তো ম্যুনিকে যাস নি কাজেই জানিস নে মানুষ সেখানে কি পরিমাণ বিয়ার খায়। তাই সবাইকে যেতে হয় ঘন ঘন বিশেষ স্থলে। আমি এসব জিনিস খাই নে, কিন্তু তাই নিয়ে তো মারিয়া আর তর্কাতর্কি জুড়তে পারে না।'

চাচা বললেন, 'বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কবে ঠাণ্ডা বাতাস বুকের ভিতর নিয়ে সিগার-সিগরেটের ধুঁয়ো যতটা পারি ঝেঁটিয়ে বের করলুম। মারিয়াটা যে এত মিটমিটে শয়তান কি করে জানব বল। কিন্তু মারিয়ার কথায় মনে পড়ল, ওকে ফেলে তো বাড়ি যাওয়া যাবে না। বুড়োবুড়ী তা হলে সত্যই দুঃখিত হবেন। ভাববেন, এই সামান্য দায়টুকু আমি এড়িয়ে গেলুম। কিন্তু ততক্ষণে একটা দাওয়াই বের করে ফেলেছি। শরাবখানার ঠিক মুখোমুখি ছিল আরেকটি ছোটাসে ছোটা বিয়ার-ঘর। সেখানে কফিও পাওয়া যায়। অধিকাংশ খদ্দের ওখানে ঢুকে 'বারে' দাঁড়িয়ে ঝপ করে একটা বিয়ার খেয়ে চলে যায়, আর যারা নিতান্ত নিরামিষ তারা বসে বসে কফিতে চুমুক দেয়। স্থির করলুম, সেখানে বসে কফি খাব, আর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখব। যদি মারিয়া বেরোয় তবে তক্ষুণি তাকে ক্যাঁক করে ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি না বেরোয় তবে ঘণ্টাখানেক বাদে মারিয়াকে তত্ত্বতাবাশ

করব। শ্যেনও ততক্ষণে ফের কবুতর হয়ে যাবে আশা করাটা অন্যায় নয়!'

চাচা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপস্। কি মারাত্মক ভুলই না করেছিলুম সেই বিয়ারখানায় ঢুকে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে দেখি সেই কপোতী শরাবখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর ঢুকল সেই বিয়ারখানাতে। আমার তখন আর লুকোবার বা পালাবার পথ নেই। আমাকে দেখে মেয়েটির মুখে বিদ্যুৎ-চমকানো-গোছ হাসির ঝিলিক মেরে উঠল। ঝুপ করে পাশের চেয়ারে বসে বলল, 'একটু দেরি হলো। কিছু মনে করো নি তো!' বলে দিল আমার হাতে হাত, পায়রার বাচ্চা যে রকম মায়ের বুকে মুখ গোঁজে।

বলে কি! ছন্ন না মাথা খারাপ। আপন মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝলুম, এরকম ধারা চলে এসে অন্য জায়গায় বসাটা হচ্ছে এদেশের প্রচলিত সঙ্কেত। অর্থটা ' 'সপত্ন' (অর্থাৎ পুং-সতীন) ব্যাটাকে এড়িয়ে চলে এস বাইরে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' তাই সে এসেছে।

মেয়েটা আবার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিন্তু ভাই তুমি কায়দাটা জানো ভালো। টেবিলে তো ভাবখানা দেখালে আমাকে যেন কেয়ারই করো না।' বলে আমার গালে দিল একটি মিষ্টি ঠোনা।'

চাচা বললেন, 'আমি তখন মরমর। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'আপনি ভুল করেছেন। আমায় মাপ করুন।' মেয়েটা তখন একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমাদের এই প্রাচ্যদেশীয় টানা-ঠ্যালা, টানা-ঠালা কায়দা থামাও। আমার সময় নেই। হয়ত এতক্ষণে আমার বন্ধুর সন্দেহ হয়েছে আর হঠাৎ এখানে এসে পড়বে। তাহলে আর রক্ষে নেই। তোমার ফোন নম্বর কত বলো। আমি পরে কণ্টাক্ট করবো। তখন তোমার সব রকম খেলার জন্য আমি তৈরী হয়ে থাকব।'

বাঁচালে। নম্বরটা দিলেই যদি মেয়েটা চলে চায় তাহলে আমিও নিষ্কৃতি পাই। পরের কথা পরে হবে। নম্বর বলতেই মেয়েটা দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি দিয়ে চট করে সিগারেটের প্যাকেটে নম্বরটা টুকে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুশমন এসে ঘরে ঢুকল।

তার চেহারা তখন কপোতের মত তো নয়ই, বাজপাখির মতও নয়, মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে, যেন চীনা ড্র্যাগন।

আর সে কী চীৎকার আর গালাগালি! আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেব্বাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। একই টেবিলে ওয়াইন খেয়ে, বন্ধুত্ব জমিয়ে এরকম ব্ল্যাকমেলিং, ব্যাকস্ট্যাবিং—আল্লা জানেন, আরো কত রকম কথা সে বলে যাচ্ছিল। সমস্ত বিয়ারখানার লোক তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছে। আমি হতভম্বের মত ঠায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটা তার আস্তিন ধরে টানাটানি করে বার বার বলছে, 'হান্‌স্, হান্‌স্, চুপ করো; এখানে সীন করো না। ওঁর কোনো দোষ নেই—আমিই—'

কনুই দিয়ে মেয়েটার পেটে দিল এক গুঁত্তা। চেঁচিয়ে বললে, 'হটে যা মাগী'—অথবা তার চেয়েও অভদ্র কি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল আমার ঠিক মনে নেই। চটলে নাৎসিরা মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে সেটা না দেখলে বোঝবার উপায় নেই। হারেমে বুখারার আমীর তাদের তুলনায় কলসী-কানার বোষ্টম। গুঁতো খেয়ে মেয়েটা কোঁক্ করে, অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে একটা চেয়ারে নতিয়ে পড়ল।

এই বকাবকি আর আর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ড্র্যাগন আস্তিন গুটোয় আর বলে, 'আয়, এর একটা রফারফি হওয়ার দরকার। বেরিয়ে আয় রাস্তায় বাইরে।' '

চাচা বললেন, 'আমি তো মহা বিপদে পড়লুম। অসুরের মত এই

দুশমনের হাতে দুটো ঘুষি খেলেই তো আমি উসপার্। ক্ষীণ কণ্ঠে যতই প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করি যে ফ্রলাইনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, আমার মনে কোনোরকম মতলব নেই, ছিল না, হওয়ার কথাও নয়, সে ততই চেঁচায় আর 'কাপুরুষ' বলে গালাগালি দেয়।'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা শুধাল, 'আর কেউ মূর্খটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল না যে, আপনি নির্দোষ?'

চাচা বললেন, 'তুই এদেশে নূতন এসেছিস তাই এ-সব ব্যাপারের মরাল অথবা ইমরাল কোডের খবর জানিস নে। এদেশে এসব বর্বরতাকে বলা হয়, 'অন্যলোকের ঘরোয়া মামেলা' Personal matter. এরা আসলে থাকে বিন্‌টিকিটে মজা দেখবে বলে।'

চাচা বললেন, 'ততক্ষণে অসুরটা আবার নাৎসি বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে। 'যত সব ইহুদি আর বাদ-বাকী কালা-আদমী নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো, এই করেই বর্ণসঙ্কর (অবশ্য একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল) হয়, এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে, অথচ জর্মনির আজ এমন দুরবস্থা যে এরকম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারছে না।' বিশ্বাস করবে না, দু'এক-জন ততক্ষণে তার কথায় সায় দিতে আরম্ভ করেছে আর আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি দুনিয়ার সব চেয়ে মিটমিটে শয়তান, আর কাপুরুষস্য কাপুরুষ।

মাপ চেয়ে নিলে কি হত বলতে পারি নে কিন্তু মাপ চাইতে যাব কেন? আমি দোষ করিনি এক ফোঁটা, আর আমি চাইতে যাব মাপ। ভয় পাই আর নাই পাই, আমিও তো বাঙাল। আমার গায়ের রক্ত গরম হয় না? দুনিয়ার তাবৎ বাঙালদের মানইজ্জৎ বাঁচাবার ভার আমার উপর নয় জানি, কিন্তু এই বাঙালটাই বা এমন কি দোষ করল যে লোকে তাকে কাপুরুষ ভাববে?'

চাচা বললেন, 'আমি বললুম, 'এসো তবে, যখন নিতান্তই

মারামারি করবে বলে মনস্থির করেছ, তবে তাই হোক্!' মনে মনে বললুম, দুটো ঘুষি সইতে পারলেই চলবে, তারপর তো নিঘাত্ত অজ্ঞান হয়ে যাব।'

এমন সময় হুঙ্কার শুনতে পেলুম, 'এই যে! সব ব্যাটা মাতাল এসে একত্তর হয়েছে হেথায়। এসো, এসো, আরেক পাত্তর হয়ে যাক্, মেলার পরবে—''

চাচা বললেন, 'তাকিয়ে দেখি অস্কার। একদম টং। এক বগলে খালি বোতল, আরেক বগলে ডানা-কাটা পরী। পরীটিও যেন শ্যাম্পেনের বুদ্বুদে ভর করে উড়ে চলেছেন। সেই উৎকট সঙ্কটের মাঝখানেও না ভেবে থাকতে পারলুম না, মানিয়েছে ভালো।

অস্কারকে দুনিয়ার কুল্লে মাতাল চেনে। আমার কথা ভুলে গিয়ে সবাই তাকে উদ্বাস্তু হয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক, 'বার'-এ দাঁড়াতে আজ্ঞা হোক' বলে অকৃপণ অভ্যর্থনা জানালো।

ওদিকে আমার মোষটা বাধা পড়ায় চটে গিয়ে আরো হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'তবে আয় বেরিয়ে।'

তখন অস্কারের নজর পড়ল আমার দিকে। আমাকে যে কি করে সে-অবস্থায় চিনতে পারল তার সন্ধান সুস্থ লোক দিতে পারবে না। পারবেন দিতে অস্কারের মত সেই গুণী যিনি 'মৌজের গৌরীশঙ্কর চড়ে জাগরণসুষুপ্তিস্বপ্নতুরীয় ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁছতে পারেন। কাইজারের জন্মদিনের কামানদাগার মত আওয়াজ ছেড়ে বললে, 'ঐ রেঃ! ঐ ব্যাটা কালা ইণ্ডার, মিশ্ শয়তানও এসে জুটেছে। যেখানেই যাও, শয়তানের মত সব জায়গায় উপস্থিত। বিয়ার ধরেছিস নাকি? এক পাত্তর হয়ে যাক্! আজ তোকে খেতেই হবে। মেলার পরব।'

ষাঁড় আবার হুঙ্কার ছেড়েছে! অস্কার তার দিকে তাকিয়ে আর তার আস্তিন-টানা মারমুখো তসবির দেখে আমাকে শুধালো, 'ইনি কিনি বটেন?'

আমি হামেহাল 'জেন্টিলম্যান'। শাস্ত্রসম্মত কায়দায় পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু দুশমন অস্কারকে চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি বাইরে থাকো, ছোকরা। এর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।'

অস্কার প্রথমটায় এরকম মোগলাই মেজাজ দেখে একটুখানি থতমত খেয়ে গেল। খালি বোতলটায় একটা টান দিয়ে অতি ধীরে ধীরে মিনিটে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, 'এর—সঙ্গে—আমার—বোঝাপড়া—আছে? কেন বাবা, এত রাগ কিসের? এই পরবের বাজারে? তা ইণ্ডারটা ঝগড়াটে বটে। হলেই বা। এস, বেবাক ভুলে যাও। খেয়ে নাও এক পাত্তর। মনে রঙ লাগবে, সব ঝগড়া কপ্পুর হয়ে যাবে।'

বলে জুড়ে দিল গান। অনেকটা রবিঠাকুরের 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে' গোছের।

দুশমন ততক্ষণ আমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এসেছে।

'হাঁ হাঁ করো কি, করো কি?' বলে অস্কার তাকে ঠেকালো। অস্কার আমার সপত্নের চেয়ে দু'মাথা উঁচু। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? নাৎসিদের ফের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?'

আমি যতটা পারি বোঝালুম। শেষ করলুম, 'কী মুশকিল!' বলে।

অস্কার বলল, 'তা আমি কি তোর মুশকিল-আসান নাকি, না তোর ফ্যুরার। আর দেখছিস না ও আমার পার্টির লোক।' আমি হাল ছেড়ে দিলুম।

কিন্তু অস্কারকে বোঝা ভার।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেই ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল, 'ইণ্ডারটা তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেছিল?' আমি বললুম, 'ছিঃ অস্কার!' সপত্ন বলল, 'চোপ্!'

অস্কার শুধাল, 'চুমো খেয়েছিল?' আমি বললুম, 'অস্কার!' সপত্ন বলল, 'শাট আপ্!'

তখন অস্কার সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটিকে দু'হাত দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড় করাল। বললে, 'খাসা মেয়ে!' তারপর বলা নেই কওয়া নেই তাকে জড়িয়ে ধরে বমশেলের মত শব্দ করে খেল চুমো।

সবাই অবাক! আমিও। কারণ অস্কারকে ওরকম বেহেড মাতাল হতে আমিও কখনো দেখি নি। কিন্তু আমারই ভুল।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে ফেলে সে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সেই ছোকরার। একদম সাদা গলায় বলল, 'দেখো বাপু, আমার বন্ধু ইওারটি তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে নি, চুমোও খায় নি। তবু তুমি অপমানিত বোধ করে তাকে ঠ্যাঙাতে যাচ্ছিলে। ও রোগা টিঙটিঙে কিনা। ওঃ, কী সাহস! কিন্তু আমি তোমার বান্ধবীকে চুমো খেয়েছি। এতে তোমার জরুর অপমান বোধ হওয়া উচিত। আমিও সেই মতলবেই চুমোটা খেলুম। তাই এসো, পয়লা আমাকে ঠ্যাঙাও তারপর না হয় ইওারটাকে দেখে নেবে।'

হুলুস্থুল পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই। ছোকরা পড়ে গেল মহা বিপদে। অস্কারের সঙ্গে বক্সিং লড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। গেল বছরই এ অঞ্চলের চেম্পিয়ন হয়েছে ঐ সামনের শরাবখানাতেই। ছোকরা পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু অস্কার না-ছোড়-বান্দা। আর পাঁচজনও কথা কয় না—এরকম রগড় তো পয়সা দিয়েও কেনা যায় না। সব পার্সনাল ম্যাটার কিনা!

কিন্তু আমি বাপু ইওার, কালা আদমী। আমি ছুটে গিয়ে ডাকলুম পুলিশ। ফিরে দেখি ছোকরা মুখ বাঁচাবার জন্য মুখ চুন করে কোট খুলছে আর শার্টের আস্তিন গুটোচ্ছে। অস্কার যেন খাসা ভোজের প্রত্যাশায় জিভ দিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ শব্দ করছে।

পুলিশ নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধা দিল। ট্যাক্সি ডেকে কপোত-কপোতীকে বিদেয় করে দিল।

অস্কার বলল, 'ওরে কালা শয়তান, কোথায় গেলি? আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

বান্ধবী সোহাগ ঢেলে শুধালেন, আপনি কোন্ দেশের লোক।' পয়লা কপোতীও ঠিক এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল।

আমি দিলুম চম্পট। অস্কার চেঁচিয়ে শুধালো, 'যাচ্ছিস কোথায়?' আমি বললুম, 'আর না বাবা। এক রাত্তিরে দু' দু'বার না।'

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

(হাইনে)

আম্ গাঙ্গেস্ ডূফ্‌টেটস্ লয়েস্‌টটস
উন্‌ট্ রীসেনবয়মে ব্লায়েন,
উন্‌ট শোনে স্টিল্লে মেনশেন
ফর লোটস্‌ব্লুমেন ক্নিয়েন।

পিটার ও শয়তান

নরক আর স্বর্গের মধ্যিখানে মাত্র একটি পাঁচিলের ব্যবধান। নরক চালায় শয়তান, আর স্বর্গ চালান সিন্ট পীটার। পাদ্রীসায়েবের মুখে শোনা, তাঁরই হাতে থাকে স্বর্গদ্বারের সোনার চাবি।

পাঁচিলটি ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে দেখে পীটার একদিন শয়তানকে ডেকে বললেন, 'দেয়ালটা এজমালি। তাই এটার মেরামতি আমি করবো এক বছর, তুমি করবে আর বছর। আসলে তোমারই করা উচিত প্রতি বছর। কারণ তোমার দিকে সুবো-শাম জ্বলছে আগুনের পেল্লাই পেল্লাই চুলো। তারই চোটে দেয়াল হচ্ছে জখম। আর আমার দিকে সবক্ষণ বয় মন্দ মধুর মলয় বাতাস। দেয়াল বিলকুল জখম হয় না।

বিস্তর তর্কাতকির পর স্থির হল, ইনি এ বছর আর উনি আর বছর দেয়াল মেরামত করবেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় শয়তান ঘাড় চুলকে বললে, 'দাদা, কিছু যদি মনে না করো, তবে এ বছরটায় তুমিই মেরামতিটা করাও। আমি একটু অভাবে আছি'।'

পীটার মাই ডিয়ার লোক। রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর এক বছর যায়, দু'বছর যায়, পাঁচ বছর যায়, দেয়াল পড়ো পড়ো—শয়তানের সন্ধান নেই। পীটার রেজেস্ট্রি করে চিঠি লিখলেন। ফেরত এলো। উপরে লেখা, 'মালিক না পাইয়া ফেরত।' পীটার তখন একাধিকবার শয়তানের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠ বেরলো—'কত্তা বাড়ি নেই।' পীটার বাড়ির সামনে 'লটকাইয়া লটকাইয়া সমন জারী' করলেন। কোনো ফায়দা ওৎরালো না।

এমন সময় পীটারের বরাত জোরে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাত। শয়তান অবশ্য তড়িঘড়ি পাশের গলিতে গা ঢাকা

দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এঞ্জেলদের ডানা থাকে। ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে পার্ফেক্ট ল্যাণ্ডিং করে দাঁড়ালেন তার সামনে। খপ্ করে হাত ধরে বললেন, 'বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? দেয়াল মেরামতির কী হবে?'

শয়তান গাঁইগুঁই, টালবাহানা আরম্ভ করলে। পীটার চেপে ধরলেন, 'পাকা কথা দিয়ে যাও।'

তখন শয়তান শেষ কথা বললে, 'কিছু মনে করো না ভাই, কিন্তু আমি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো পাকা কথা দিতে পারবো না।'

নিরাশ হয়ে পীটার শয়তানের হাত ছেড়ে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ি ফেরার মুখ করে বললেন, 'ঐখানেই তো তোর জোর। সব কটা নিয়ে বসে আছিস। আমার যে একটাও নেই।'

কোথা হায় সেই আনন্দনিকেতন?
স্বপ্নেই শুধু দেখি যে ভুবন আমি,
রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, যামী
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।
(আইটেল শাউম্)

আখ, ইয়েনেস লান্ট ভের ভনে,
ডাস্ জে ইখ্ অফ্‌ট্ ইম্ ট্রাউম;
ডখ্‌কম্‌ট্ ডী মর্গেন্‌জেনে,
ফেরফ্লীস্‌ট্‌স্ ডী আইটেল্ শাউম্।

অনুকরণ না হনুকরণ ?

আগে-ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—দুষ্টলোকে বলে, শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পছলে নিবেদন করি :—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারী, তাই ফাতনা ডোবে কালে-কস্মিনে, আকছার রববারই যায় বিন্-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে। দু'জনায় আলাপ পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর শিকারী লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির সুরে শুধালে, 'ওহে, তুমি তাহলে নিজেই মাছ ধর না কেন ?'

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে, 'বাপস। অত ধৈর্য আমার নেই।' সমালোচনা লেখার ধৈর্য আমার নেই।

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে ? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে ? কটা বুদ্ধিমান মাছ টোপ গেলে ? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচক প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয় অনেকেই —অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী যখম হয়ে "দুত্তোর ছাই" বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না।

মারোয়াড়ীরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, 'সৎসাহিত্য' তথা 'সমালোচকদের' পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আপ্তবাক্য নিবেদন করছি, 'পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না।' নাহলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচকদেরই মত।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগাণ্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাত করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। না হলে আওয়ামীরা মুসলিম লীগকে কস্মিন্ কালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্প্যানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্প্যানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আর আমাদের অন্যকার রুটি দাও।' খানিকটা চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।' তারপর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মা-কালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, 'সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ' সেই 'গেল বছরের মতো—এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে নি।

কথাটা যেভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া

বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠকসাধারণ মাত্রেরই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্য কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয় নি এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো, ঘোঁট বাড়ানো শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আণ্ডাটা—থাক্।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয়—এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও-লেখাটা না পড়তে।

* *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?'

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলাদেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে গিয়ে কিঞ্চিৎ তদ্বির করলেই, দু'চারটে প্রাইজ পেয়ে যাবো, লোকসভার সদস্যগিরি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বরী এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিলেত দেখার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠে নি; ইংরিজিটা জানি নে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল! এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজি না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা—টিপসই করে হালে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে

চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি কইলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কি? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায়-টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিত-পটুত্ব। যে-সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীর আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন—শুনে দুঃখিত হবেন।

* *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান করো। সেই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য সফরী-প্রোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সবচেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই: 'মপাসাঁর ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণকারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন? অপিচ, মপাসাঁ ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুসরণ না করে গল্প লিখিই বা কি প্রকারে?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যে-ভাবে গান গান তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাক্ষিসুন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অনুকরণ

করতে, হত ততোধিক কাল। স্যাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বললে, 'এত বেশী অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজন-শক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকানো আছে।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই, আরম্ভ হয়ে যায় 'এপিক' লেখা, তু'কলম চলতে না শিখেই ডান্‌স্ 'কম্পোজ' করা, আরো কত কী, এবং সবকমে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়াব পন্থা তো সব সময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলাগারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?' সুস্থ লোকের মত বললে, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—টুইশনি নেব।' তারপরে এক গাল হেসে বললে, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।' সমালোচক সব সময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্-তালিমের 'আরিজিনালিটি' পাঠকসাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কি?' তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করলে এবং শুধু অনুকরণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেলেন

চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন 'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট-ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবণ্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্‌পাস্‌ উস্‌পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পাঁচশ টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে নেমে কি হয়।

ছাব্বিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন বারো নম্বর!

তার সরল অর্থ, ঐ ছোট শহর, ধেড়ধেড়ে ডিহি গোষ্ঠিপুরে বারো জন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কি করে প্লে করতে হয়!

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো!'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন এঁরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্করাতে পরিণত করেছেন, চার্লি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমীন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন, চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশী সোনালী ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের 'দোদুল-দোলা', 'ব্যাকুল বেণু', 'উদাস হিয়াকে' 'দোলাতর', 'বেণুতর' করে নিত্য নিত্য কত না নবনব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুল্লুক

পরশু দিনের গড়া নবীন দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীনদেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিন্যাস। বুদ্ধের কীর্তি-কাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদৃপ্ত কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নয়নে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলো, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিন্তু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তা-বাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বললে, 'আমি এ ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে শুধালেন, 'কিন্তু বৎস তোমাকে তো আমি চেনবার

অবকাশ পাই নি। তুমি কি সত্যই এ কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘ দিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো!'

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিষ্য তখন গলা খুলে গাধার মতো, হুবহু গাধার মতো চেঁচিয়ে উঠল। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালে।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিৎকার করে কথা বলতেন। ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাঁচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

> To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।
> To ape-এর বাঙলা হনুকরণ।'
> এ স্থলে রাসভকরণ।

তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার?
দুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসায়ে দিলেম আমি
দীরঘ নিশাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরযামী।
শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমাবে মোর কিছু নাহি আর
ত্বরা এসো বঁধু, বেগে এসো প্রভু, নামাও বেদনাভার।

কথিত আছে, একদা নসরুদ্দীন্ খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরানদেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা-খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্করসহ উজীর-ই-আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্ন সহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ-ইন-শাহ্, আপনার যে পুত পবিত্র'···ইত্যাদি * বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ্ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই।

* ইরানে বাদশার সামনে কোন্ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' পশ্য।

ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই 'হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজার পানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ। আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড!

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে না যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আল-বোলা, রাজস্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সরন-দ্বীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে দু'একজন অমিতবীর্য অসীম সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায়নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি!

ইরানের বাদশা খুশীতে খলাফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন মাস ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজার নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছুমাসের কয়েকদিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণা হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হুজুর। তবে কিনা, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হ'ত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—

বাদশাব তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে ছুহুঁ ছুহুঁ হয়ে কুহু কুহু করবেন।

ছু-পাত্র শিবাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত্। রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমাব রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদেব দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত্—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত্ যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তেব জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা খ্যাকখ্যাক করে বিশ্রী হাসতে লাগলেন।

না-হক বেইজ্জৎ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জহাঁপানা কুল্লে ছুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সকলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত্।

উদ্গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তর্কী তরুণী আপনার জন্য এনেছি হুজুর।'*

*ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজি অনুবাদ আছে,—

'If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her and
"I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিংবা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight;
and bid these arms thy neck infold;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand."

ঝঙ্কারের জন্য মূল :

'অগ আন্ তুর্ক্-ই-শিরাজ
বদস্ত্ আবদ্ দিল-ই মারা
ব্ খাল-ই হিন্দো ওশ্ বখ্শম্
সমর্কন্দ্ ওয়া বুখারারা।'

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল।

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণন 'ওহো হো হো, একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন। কী দোলন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল – আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্, আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন আমি আন।

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম তু জাঁ শুদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ঈঁ মন্ দিগরম্ তু দিগরী।'

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥

আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"

অনুবাদকের টিপ্পনী

আন্তন চেখফের রচনায় রাশার যে যুগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাদের জমিদারী-যুগের প্রচুর মিল দেখতে পাই। সেই কারণেই বোধহয় আমাদের শরৎচন্দ্র প্রচুর রাশান উপন্যাস, ছোট গল্প অতিশয় মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, তাই তাঁর পরিণত বয়সের লেখাতে অন্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। তবে যদি কোনো সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকে তবে সেটা রুশ সাহিত্য। তাঁর 'দত্তা'র সঙ্গে এ-নাটিকার কোনো মিল নেই, কিন্তু দুটিতেই আছে একই জমিদারির আবহাওয়া।

চেখফ যে যুগের বর্ণনা দিয়েছেন সে সময় একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্নভাবে ডাকত। যেমন এই নাটিকার নায়িকার নাম নাতালিয়া স্তেপানভনা চুবুকফ। অতি অল্প পরিচয়ে লোক তাকে ডাকবে মিস চুবুকফ বলে। যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, তারা ডাকবে নাতালিয়া স্তেপানভনা (স্তেপানভনা=স্তেপানের মেয়ে)। যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তারা ডাকবে শুধু নাতালিয়া, এবং যারা নিতান্ত আপন জন তারা ডাকবে নাতাশা। এখনো বোধহয় এই রীতিই প্রচলিত আছে, তবে যে-স্থলে মিস চুবুকফ বলা হত আজ বোধহয় সেখানে কমরেড চুবুকফ বা চুবুকভা বলা হয়।

পাত্র-পাত্রীগণ :

স্তেপান স্তেপানভিচ চুবুকফ—জমিদার।

নাতালিয়া (ডাক নাম নাতাশা) স্তেপানভনা চুবুকফ—ঐ জমিদারের কন্যা; বয়স ২৫।

ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ লমফ্—চুবুকফের প্রতিবেশী জমিদার, স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু সমস্তক্ষণ ভাবেন তিনি বড্ডই অসুস্থ (হাইপোক্রোন্ডিআক)।

ঘটনা চুবুকফের জমিদারীতে।

(চুবুকফের ড্রইংরুম। চুবুকফ এবং লমফ্, ঈভনিং ড্রেস এবং সাদা দস্তানা পরে লমফের প্রবেশ)

চুবুকফ্: (লমফের দিকে এগিয়ে গিয়ে) এস, এস, বন্ধুবব। এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! কিন্তু বড় আনন্দ হল, বড়ই আনন্দ হল (হ্যাণ্ডশেক্)। সত্যি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে, ভায়া। কি রকম আছ?

লমফ্: ধন্যবাদ। আর আপনি কি রকম আছেন?

চুবুকফ: মোটামুটি আমাদের ভালোই যাচ্ছে, বাছা—তোমাদের প্রার্থনা আর-যা-সব-কি-সব তো রয়েছে। বসো, বসো। জানো, এরকম করে পুরনো দিনের প্রতিবেশীকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত? বড় খারাপ, বড্ডই খারাপ। কিন্তু বলো দিকিনি, এত সব ধড়াচুড়ো পরে কেন? পুরে-পাক্কা ফুল ডিনার ড্রেস, হাতে দস্তানা আর-যা-সব-কি-সব? কারো সঙ্গে পোশাকী দেখা করতে যাচ্ছো নাকি, না অন্য কিছু ভায়া?

লমফ্: আজ্ঞে না, শুধু আপনাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

চুবু: তবে ফুল ডিনার ড্রেস কেন, ভায়া। মনে হচ্ছে তুমি যেন নববর্ষে পোশাকী মোলাকৎ করতে এসেছ!

লমফ্: ব্যাপারটা হচ্ছে··(চুবুকফের হাত ধরে)···আমি কিনা, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে, স্যব—শুধু আশা করছি আপনি বিরক্ত হবেন না। আপনার কাছ থেকে এর আগেও আমি সাহস করে কয়েকবার সাহায্য চেয়েছি এবং আপনিও, সব সময়েই, বলতে কি···কিন্তু মাফ করুন, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে···আমি একটুখানি জল খাই। (জলপান)

চুবু: (নেপথ্যে) টাকা ধার চাইতে এসেছে নিশ্চয়ই। দেব না (লমফ্‌কে) কি হয়েছে, বলো না ভায়া।

লমফ্: দেখুন স্যর,…কিন্তু মাফ করুন, স্যর…আমার সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে…দেখতেই পাচ্ছেন…মানে কিনা, আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এ যাবৎ আপনার জন্য এমন কিছু করতে পারি নি যার জন্য আপনার কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, সত্যি, আমার সে হক্ক আদপেই নেই…

চুবু: কী বিপদ! অত সুতো ছাড়ছ কেন ভায়া। বলেই ফেল না, কি হয়েছে বলো।

লমফ্: বলছি, বলছি, এখ্খুনি বলছি…ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমি আপনার মেয়ে নাতালিয়া স্তেপানভনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

চুবু: (সোল্লাসে) ইভান ভাসিয়েলিভিচ্। প্রাণের বন্ধু আমার। ফের বলো তো, কি বললে। আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাই নি।

লমফ্: অতিশয় সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি…

চুবু: (বাধা দিয়ে) সোনার চাঁদ ছেলে। আমি যে কী খুশী হয়েছি আর-যা-সব-কি-সব। নিশ্চয় নিশ্চয় আর-যা-সব-কি-সব। (লমফ্‌কে আলিঙ্গন ও চুম্বন) ঠিক এই জিনিসটিই আমি বহুকাল ধরে চাইছিলুম (এক ফোঁটা চোখের জল) তোমাকে আমি চিরকালই আপন ছেলের মত স্নেহ করেছি। ভগবান তোমাদের হৃদয়ে একে অন্যের জন্য প্রেম দিন, তোমাদের মিল হোক, আর-যা-সব-কি-সব। সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়েই চেয়েছিলুম… কিন্তু আমি এখানে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছি কি? আমাকে কেউ যেন আনন্দের ডাণ্ডা মেরেছে—আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না! আহা, আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে—আমি গিয়ে নাতাশাকে ডাকছি, আর-যা-সব-কি-সব—

লমফ: স্তর, উনি কি বলবেন আপনার মনে হয়? তিনি সম্মতি দেবেন, আশা করতে পারি?

চুবু: কি বললে? নাতাশা যদি রাজী না-ও হতে পারে! অবাক করলে! আর তোমার চেহারাটাও চমৎকার নয়? ধরো বাজি, ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আর-যা-সব-কি-সব। আমি এখুনি তাকে বলছি গে। (নিষ্ক্রমণ)

লমফ (একা): আমার শীত শীত করছে···আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, যেন পরীক্ষার হলে যাচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, মন স্থির করা। বেশী দিন ধরে শুধু যদি ভাবতেই থাকো, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে শুধু আলোচনা করো, গড়িমসি গাড়িমসি করতে থাকো, আর কোন এক আদর্শ রমণীর জন্য কিংবা খাঁটি, সত্য প্রেমের জন্য পথ চেয়ে থাকো, তবে তোমার কখ্খনো বিয়েই হবে না। উহুহুহু···কী শীত করছে আমার! নাতালিয়া স্তেপানভনা সংসার চালায় চমৎকার, লেখাপড়ি করেছে আর দেখতেও খারাপ নয়···এর বেশী আমার কীই বা চাই? কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। মাথাটা তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। (জল পান) কিন্তু আমার আইবুড়ো হয়ে থাকা চলবে না। পয়লা কথা, আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়: আমাকে মেপেজুকে ছকে-কাটা জীবন চালাতে হবে···আমার বুকের ব্যামো রয়েছে, ভিতরটা সর্বক্ষণ ধড়ফড়···আমি কত সহজেই রেগে কাঁই হয়ে যাই আর কত সহজেই উত্তেজনার চরমে পৌঁছে যাই···এই তো, এই এখখুনি আমার ঠোঁট কাঁপছে আর ডান চোখের পাতাটা নাচছে···কিন্তু সব সব চেয়ে বিপদ আমার ঘুম নিয়ে। বিছানায় যেই শুয়েছি আর চোখদুটো জুড়ে আসছে, অমনি কি-যেন কি-একটা আমার বাঁ পাশটায় ছোরা মারে। একেবারে ছোরা মারার মত! আর সেটা সরাসরি আমার কাঁধের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথা অবধি পৌঁছে যায়···আমি ক্ষ্যাপার মত লাফ

দিয়ে উঠি, খানিকটা পায়চারি করি, ফের শুয়ে পড়ি···কিন্তু যেই না আবার ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল আর অমনি আবার পাশের দিকটায় সেই ছোরার ঘা—আর ঐ একই ব্যাপার নিদেন কুড়িটি বার···

(নাতালিয়ার প্রবেশ)

নাতালিয়া : ও, আপনি অথচ বাবা বললেন : যাও খদ্দের মাল নিতে এসেছে। কি রকম আছেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ্?

লমফ্ : আপনি কি রকম, নাতালিয়া স্তেপানভনা?

নাতালিয়া : কিছু মনে করবেন না, আমার এখন পরা রয়েছে, ভদ্র-দুরুস্ত জামা-কাপড় পরি নি বলে। আমরা মটরশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিলুম রোদ্দুরে শুকোবার জন্যে। এতদিন আমার সঙ্গে যে বড় দেখা করতে আসেন নি? বসুন না···(দুজনেই বসলেন) দুপুরবেলা এখানে খাবেন?

লমফ্ : না। অনেক ধন্যবাদ। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : সিগারেট খাবেন না? এই তো দেশলাই···আজকের দিনটা চমৎকার, কিন্তু কাল এমনি জোর বৃষ্টি হল যে মজুরেরা সমস্ত দিন কিছুই করতে পারলো না। জানেন, আমরা কাল ক'গাদা খড় তুলতে পেরেছি? বিশ্বাস করবেন না, আমি সব খড় কাটিয়ে নিয়েছিলুম, আর এখন তো আমার প্রায় দুঃখ হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, সব খড় পচে না যায়। হয়তো অপেক্ষা করলে ভালো হত। কিন্তু এসব কি? আমার মনে হচ্ছে আপনি ধড়াচুড়ো পরেছেন। এ তো নতুন দেখলুম। আপনি কি বল নাচ কিংবা অন্য কিছু একটায় যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনি বদলে গেছেন—ভালো দেখাচ্ছে আগের চেয়ে!···কিন্তু, সত্যি, আপনি ধড়াচুড়ো পরেছেন কেন?

লমফ্ : (উত্তেজিত হয়ে) ব্যাপারটা কি জানেন, নাতালিয়া স্তেপানভনা···আসলে কি জানেন; আমি মনস্থির করেছি,

আপনাকে···মন দিয়ে শুনুন···আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন, হয়তো বা রাগ করবেন, কিন্তু আমি···(নেপথ্যে) আমি শীতে জমে গেলুম।

নাতালিয়া : কি বলুন তো। (একটু থেমে) বলুন।

লমফ্ : সংক্ষেপেই বলি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, শ্রীমতী নাতালিয়া স্তেপানভনা, যে, আমি বহুকাল ধরে আপনাদের পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি—ছেলে বয়েস থেকে, সত্যি বলতে কি। আমার যে পিসিমার কাছে থেকে তিনি গত হলে পর তাঁর জমিদারী পেয়েছি তিনি আর পিসেমশাই দুজনাই আপনার পিতা এবং স্বর্গত মাতাকে গভীর সম্মানের চক্ষে দেখতেন। লমফ্ আর চুবুকফ পরিবারে বরাবরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এমন কি ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বলা চলে। তা ছাড়া, আপনি জানেন, আমার জমিদারী আপনাদের জমিদারীর একেবারে গা ঘেঁষে। আপনার হয়তো মনে পড়বে আমার ভলোভী মাঠ আপনাদের বার্চ বনের লাগাও।

নাতালিয়া : মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার কথা কাটতে হল। আপনি যে বলেছেন, 'আমার' ভলোভী মাঠ··কিন্তু ওটা কি সত্য আপনার ?

লমফ্ : হ্যাঁ, আমার··

নাতালিয়া : তাই নাকি। এরপর আর কি চেয়ে বসবেন ! ভলোভী মাঠ আমাদের, আপনার নয়।

লমফ্ : না। ওটা আমার, নাতালিয়া স্তেপানভনা।

নাতালিয়া : এটা আমার কাছে নূতন খবর বলে ঠেকছে। ওটা আপনার হল কি করে ?

লমফ্ : তার মানে ? · আমি তো সেই ভলোভী মাঠের কথা বলছি যেটা আপনাদের বার্চ বন এবং পোড়া-বনের মাঝখানটায়···

নাতালিয়া : হ্যাঁ, সেইটের কথাই তো হচ্ছে···ওটা আমাদের।

লমফ্: না, আপনি ভুল করেছেন নাতালিয়া স্তেপানভনা, ওটা আমার।

নাতালিয়া: পাগলামি ছাড়ুন ইভান ভাসিয়েলিভিচ্! ওটা ক'দিন ধরে আপনাদের হয়েছে?

লমফ্: 'ক'দিন ধরে' মানে? যতদিন ধরে আমার মনে পড়ে— ওটা তো চিরকাল ধরেই আমাদের।

নাতালিয়া: আমাকে মাফ করতে হচ্ছে, আমি একমত হতে পারছি নে।

লমফ্: কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই দলিল-পত্রে জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। একথা অবশ্যি সত্য, যে ভলোভী মাঠের স্বত্ব নিয়ে এক সময় মতবিরোধ হয়েছিল কিন্তু এখন তো কুল্লে দুনিয়া জানে, ওটা আমার। তা নিয়ে তর্কাতর্কি করার এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি— আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার প্রপিতামহের রায়তদের ঐ মাঠটা বিনা খাজনায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করতে দেন; তার বদলে ওরা তাঁর ইটের পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার প্রপিতামহের চাষারা চল্লিশ বৎসর ধরে ওটা লাখেরাজ ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে মনে করে ওটার স্বত্ব ওদেরই। কিন্তু দাস-প্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নূতন বন্দোবস্ত হল···

নাতালিয়া: কিন্তু আপনি যা বলছেন সেটা আদপেই ও রকম ধারা নয়। আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ জানতেন যে তাঁদের জমিদারীর হদ্দ পোড়া-বন অবধি—কাজেই ভলোভী মাঠ আমাদের সম্পত্তির ভিতর পড়ল বইকি। তা হলে সেটা নিয়ে খামখা তর্ক করছেন কেন? আমি সত্যি আপনার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছি নে। হক কথা বলতে কি, আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

লমফ্: আপনাকে আমি দলিল-দস্তাবেজ দেখাব নাতালিয়া স্তেপানভনা।

নাতালিয়া : না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মস্করা করছেন কিংবা আমাকে চটিয়ে মজা দেখছেন…বাস্তবিক, এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। জমিটা প্রায় তিনশ' বছর ধরে আমাদের স্বত্বে, আর আজ হঠাৎ একজন বলে উঠলো, ওটা আমাদের নয়। মাফ করবেন, ইভান ভাসিয়েলিভিচ্, আমি আমার আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না…অবশ্য আমি ঐ জমিটার কোনো মূল্যই দিই নে। কত আর হবে—পনেরো একরটাক, তিন শ' রুবলের বেশী ওর দাম হবে না, কিন্তু ওটা নিয়ে এই নাহক অবিচার আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়। আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করতে পারি নে।

লমফ্ : আপনাকে মিনতি করছি, আমার সব কথা শুনুন। আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার পিসির ঠাকুরমার ইট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়—একথা আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আমার পিসির ঠাকুরমা তার বদলে ওদের অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে…

নাতালিয়া : ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, পিসি…আমার মাথায় এসব কিছুই ঢুকছে না। মাঠটা আমাদের, ব্যস্।

লমফ্ : ওটা আমার।

নাতালিয়া : ওটা আমাদের! আপনি ঝাড়া দু দিন ধরে তর্ক করুন, যদি সাধ যায় পনেরোটা ধড়াচুড়ো সবাঙ্গে চড়ান, কিন্তু তবু ওটা আমাদেরই, আমাদেরই, আমাদেরই!…আপনার জিনিস আমি চাই নে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা আমি হারাতে চাই নে… আপনার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন!..

লমফ্ : ও মাঠ আমি চাই নে, নাতালিয়া স্তেপানভনা, কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের কথা। আপনি যদি চান তবে ওটা আমি আপনাকে উপহার দিতে পারি।

নাতালিয়া : কিন্তু ওটা যদি বিলিয়ে দিতে হয় তো সে হক্ক তো

আমার—কারণ ওটা তো আমার জিনিস। আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ইভান ভাসিয়েলিভিচ, আমার কাছে সব-কিছু বড্ডই আজগুবি মনে হচ্ছে। এতদিন অবধি আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী বলেই মনে করেছি, আমাদের বন্ধুরূপেই আপনাকে গণ্য করেছি। গেল বছরে আমরা আপনাকে আমাদের গম-মাড়াইয়ের কলটা ধার দিলুম ; ফলে আমাদের আপন গম তুলতে তুলতে নভেম্বর হয়ে গেল। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন যেন আমরা রাস্তার বেদে। আমাকে উপহার দিচ্ছেন আমার নিজের জমি। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা কি প্রতিবেশীর আচরণ ? আমি বলবো, এটা রীতিমত বেয়াদবি—যদি শুনতেই চান…

লমফ্: অপনি বলতে চান, আমি তস্করূপ করি। আমি কখনো অন্যের জিনিস চুরি করি নি, ম্যাডাম, আর কেউ এ কথা বললে আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবো না…(দ্রুতগতিতে জগের কাছে গমন ও জল পান) : ভলোভী মাঠ আমার।

নাতালিয়া : কচু ! ওটা আমাদের !

লমফ্: ওটা আমার !

নাতালিয়া : ডাহা মিথ্যে ! আপনাকে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি ! আজই আমি আমার লোকজনকে ঐ মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাচ্ছি।

লমফ্: কি বললেন ?

নাতালিয়া : আমার লোকজন আজই ওখানে কাজ করবে।

লমফ্: আমি ওদের লাথি মেরে খেদিয়ে দেব।

নাতালিয়া : আপনার সে মুরদ নেই।

লমফ : (বুক আঁকড়ে ধরে) ভলোভী মাঠ আমার ! এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না ? আমার।

নাতালিয়া : দয়া করে চ্যাঁচাবেন না। আপন বাড়িতে বসে চ্যাঁচাতে

চ্যাচাতে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু এখানে বাড়াবাড়ি করবেন না!

লমফ্: আমার বুকের ভিতর যদি ওরকম মারাত্মক ব্যথা আর ধড়ফড়ানি না থাকতো, ম্যাডাম, আমার রগ দুটো যদি দপদপ না করতো, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলতুম। (চীৎকার করে) ভ.লোভী মাঠ আমার।

নাতালিয়া: আমাদের।

লমফ্: আমার।

নাতালিয়া: আমাদের!

লমফ্: আমার।

(চুবুকফের প্রবেশ)

চুবুকফ: ব্যাপার কি? তোমরা চ্যাচাচ্ছ কেন?

নাতালিয়া: বাবা, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু বুঝিয়ে বলো না, ভলোভী মাঠটা কার—ওঁর, না আমাদের।

চুবু: (লমফ্‌কে) মাঠটা আমাদের, বাবা।

লমফ্: মাফ করবেন, স্যর। ওটা আপনাদের হল কি করে? আপনি অন্তত হক্কের বিচার করবেন! আপনার পিসির ঠাকুমা আপনার ঠাকুরদার চাষাদের জমিটা কিছুদিনের জন্য লাখেরাজ ভোগ করতে দেন। চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সেটা ভোগ করে। ফলে আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস হয়ে যায় ওটা ওদেরই। কিন্তু পরে যখন নূতন বন্দোবস্ত হল…

চুবু: কিছু মনে করো না, বাবা…তুমি ভুলে যাচ্ছো যে ঐ জমিটার স্বত্ব আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঝামেলা ছিল বলেই চাষারা তোমার ঠাকুরমাকে কোনো খাজনা দেয় নি, আর যা-সব-কি-সব…আর এখন গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত জানে যে ওটা আমাদের—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি নিশ্চয়ই জরিপের ম্যাপগুলো দেখো নি!

লমফ্. কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব, জমিটা আমার।

চুবু: সে, বাছা, তুমি পারবে না।

লমফ্: নিশ্চয় পারবো।

চুবু: কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছো কেন, লক্ষ্মীটি! চ্যাঁচালেই কি কোনো জিনিস প্রমাণ হয়! তোমার যা হক্কের মাল তা আমি চাই নে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা ছাড়বার বাসনা আমার কণামাত্র নেই। ছাড়বো কেন? অবশ্য আখেরে যদি তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ তুমি যদি ঐ জমি নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া আরম্ভ করতে চাও, আর-যা-সব-কি-সব, তা হলে আমি বরঞ্চ আমার চাষাদের ঐ জমিটা বিলিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে না। এই হল পাকা কথা।

লমফ্: আমি তো বুঝতে পারলুম না। পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার কি হক্ক আপনার?

চুবু: আমার কি হক্ক আছে না আছে, সেটা স্থির করার ভার দয়া করে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর শোনো, ছোকরা, আমি এরকম ধরনের কথা বলা আর-যা-সব-কি-সব শুনতে অভ্যস্ত নই···আমার বয়েস তোমার ডবল, তবু তোমায় অনুরোধ করছি ওরকম মাথা গরম করে আর-যা-সব-কি-সব ও রকম ধারা আমার সঙ্গে কথা কয়ো না···

লমফ্: না। আপনারা ভেবেছেন আমি একটা আস্ত গাড়ল আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন। আমার জমি বলছেন আপনাদের আর তারপর আশা করছেন আমি সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত কণ্ঠে আর পাঁচজনের মত কথাবার্তা বলবো। ভালো প্রতিবেশী এরকম কথা বলে না, স্তেপান স্তেপানভিচ্ মশাই! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি পরের জমির বেদখলকারী!

চুবু: মানে? কি বললে?

নাতালিয়া: বাবা, এখখুনি মজুরদের মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাও।

চুবু (লমফ্কে): আপনি আমাকে কি বলছিলেন, স্যর?

নাতালিয়া: ভলোভী মাঠ আমাদের আর ওটা আমি ছাড়ব না,

ছাড়ব না, ছাড়ব না।

লমফ্: সে আমরা দেখে নেব। আমি আদালতে সপ্রমাণ করে ছাড়ব ও মাঠ আমার।

চুবু: আদালতে? আপনি আদালতে যান না, স্যর, আর-যা-সব-কি-সব। যান না, যান। আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—এতদিন ধরে শুধু অপেক্ষা করছিলে আদালতে যাবার জন্য একটা মোকা পাওয়ার আর-যা-সব-কি-সব। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি করা—ঐ তো তোমাদের স্বভাব। তোমাদের পরিবারের সব কজনাই মামলাবাজীতে ওস্তাদ। সব কটা।

লমফ্: দয়া করে আমার পরিবারের লোককে অপমান করবেন না। লমফ্গুষ্টির সবাই ভদ্রসন্তান, আপনার কাকার মত তহবিল তছরূপের দায়ে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি।

চুবু: লমফ্ পরিবারের সব কটা বদ্ধ পাগল!

নাতালিয়া: সব কটা—স্যাকুল্যে!

চুবু: তোমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঁড় মাতাল, আর তোমার ছোট মাসি নাতাসিয়া মিহাইলভনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা—এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর যা-সব-কি-সব।

লমফ্: আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো। (হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে) আমার বুকের সেই বেদনাটা চিলিক মারছে·· সব রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে···হে ভগবান জল, জল!

চুবু: তোমার বাবা ছিলেন জুয়াড়ী আর পেটুকের হদ্দ।

নাতালিয়া: তোমার পিসি ছিলেন একটি সাক্ষাৎ নারদ—গাঁ উজাড় করলে ওঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার!

লমফ্: আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে· ·আর আপনার পেটে জিলিপির প্যাঁচ···ও, আমার বুকটা গেল·· আর সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি···আমার চোখের সামনে বিজলি খেলে যাচ্ছে···আমার টুপিটা গেল কোথায়?

নাতালিয়া : এসব ছোটলোকমি ! ধাপ্পাবাজি ! নোংরামির চূড়ান্ত !

চুবু : আর তুমি কুচুটে, ভণ্ড, ছোটলোক ! হ্যাঁ তা-ই।

লমফ্ : হ্যাটটা পেয়েছি···ও আমার বুকের ভিতরটা···কোন্‌দিক দিয়ে বেরুবো ? দরজাটা কোথায় ? ও, আমি আর বাঁচবো না··· আমার পা যে আর নড়ছে না (দরজা পর্যন্ত গমন)

চুবু : (লমফ্‌কে পিছন থেকে চেঁচিয়ে) আমার বাড়িতে আর কক্‌খনো পা ফেলবে না।

নাতালিয়া : আদালতে যান ! আমরাও দেখে নেব !

(টলতে টলতে লমফের প্রস্থান)

চুবু : জাহান্নমে যাক ! (উত্তেজনার সঙ্গে পায়চারি)

নাতালিয়া : এ রকম একটা ছোটলোক দেখেছ কখনো ? এর পরও লোকে বলে প্রতিবেশীর উপর ভরসা রাখতে।

চুবু. আস্ত একটা সং ! বদমাইশ !

নাতালিয়া : পিচেশ ! অন্যের জমি বেদখল করে উল্টে দেয় গালাগাল ?

চুবু : সৃষ্টিছাড়া ব্যাটা চক্ষুশূল—জানো, ব্যাটার বেয়াদবি কতখানি ? এখানে এসেছিল প্রস্তাব পাড়তে, আর-যা-সব-কি-সব। বিশ্বাস হয় তোমার ? প্রস্তাব করতে ?

নাতালিয়া : কিসের প্রস্তাব ?

চুবু : হ্যাঁ, ভাবো দিকি নি. এসেছিল তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে !

নাতালিয়া : বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ? আমাকে বিয়ে করতে ? আমাকে আগে বললে না কেন ?

চুবু : তাইতো ধড়াচুড়ো পরে এসেছিল ! বাঁদর ! খাটাশ !

নাতালিয়া : আমাকে বিয়ে করতে ? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ?. ও ! (চেআরে পতন—গুঙরে গুঙরে) ওকে ডেকে নিয়ে এস ! ওকে ডেকে নিয়ে এস ! ও !—ডেকে নিয়ে এস !

চুবু: কাকে ডেকে নিয়ে আসব?

নাতালিয়া: শিগগির করো, জলদি যাও! আমি যে ভিরমি যাব। ওকে ডেকে নিয়ে এস! (ছন্নের মত আর্তরব)

চুবু: কি বলছো! কি চাও তুমি? (দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে) এ কী অভিসম্পাত! আমি বন্দুকের গুলিতে মরব। আমি নিজের হাতে ফাঁস পরবো! সবাই মিলে আমার সবনাশ করেছে।

নাতালিয়া: আমি মরে যাচ্ছি। ওকে ডেকে নিয়ে এস!

চুবু: বাপ্‌স্! যাচ্ছি, যাচ্ছি। ও রকম হাউমাউ করো না। (ধাবমান)

নাতালিয়া (একা, গুঙরে গুঙরে): আমরা কি করে বসেছি। ওগো, ওকে ডেকে নিয়ে এস, ফিরিয়ে নিয়ে এস!

চুবু: (দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন) এখখুনি আসছে ও—আর যা-সব-কি-সব। জাহান্নামে যাক ব্যাটা! আঃ! তুমি ওর সঙ্গে নিজে কথা বলো; আমার দ্বারা হবে না, পষ্ট বলে দিলুম!

নাতালিয়া: (গুঙরে গুঙরে) ওকে ডেকে নিয়ে এস!

চুবু: (চিৎকার করে) ও আসছে, আসছে, তোমায় বলছি তো! হে ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া কী গব্বযন্ত্রনা! আমি আমার গলায় দা বসাব! হ্যাঁ, আলবৎ। আমি আমার গলাটা কেটে ফেলব। আমরা লোকটাকে গালাগাল দিয়েছি, অপমান করেছি, লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি—আর এসবের মূলে তুমি—তুমিই করেছ এসব।

নাতালিয়া: না, তুমি!

চুবু: ও! এখন সব দোষ আমার! আর কি শুনতে হবে তারপর?

(লমফের প্রবেশ)

লমফ্: (অবসন্ন) আমার বুক ভীষণ ধড়ফড় করছে···আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে···বাঁ পাশটায় অসহ্য যন্ত্রণা···

নাতালিয়া: আমাদের মাফ করুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমরা

ঝোঁকের মাথায়···আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভী মাঠ সত্যিই আপনার।

লমফ্‌: আমার বুকটায় যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে···মাঠটা আমার··· আমার দুটো চোখ করকর করছে···

নাতালিয়া: হ্যাঁ, মাঠটা আপনার, আপনারই··· বসুন (উভয়েরই উপবেশন) আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

লমফ্‌: আমার কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের কথা···জমিটার আমি কোন মূল্য দিই নে, কিন্তু ন্যায়ের মূল্য আমি দি···

নাতালিয়া: সত্যিই তো ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা··· ওসব বাদ দিন··· অন্য কথা পাড়ুন।

লমফ্‌: বিশেষত আমার কাছে যখন প্রমাণ রয়েছে। আমার পিসিমার ঠাকুরমা আপনার বাবার ঠাকুরদার চাষাদের···

নাতালিয়া: হয়েছে, হয়েছে, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে···(স্বগত) কি করে আরম্ভ করবো, বুঝতে পারছি নে···(লাফিয়ে) আপনি কি শিগগিরই শিকারে বেরুচ্ছেন?

লমফ্‌: ভাবছি, নবান্নের পরই বন-মোরগ শিকারে বেরবো···মনে পড়ল; আপনি কি শুনেছেন, আমার কি মন্দ কপাল···আমার ট্রাইয়ার বেচারা—আপনি তো ওকে চেনেন—ওর পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া: আহা, বেচারা! কি করে হল?

লমফ্‌: আমি ঠিক জানি নে···বোধহয় পায়ের থাবা মচকে গিয়েছে, কিংবা হয়তো অন্য কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছে···(দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর, টাকার কথা না হয় বাদই দিলুম। জানেন, মিরনফকে একশ' পঁচিশ রুবল দিয়ে ওকে কিনি।

নাতালিয়া: বড্ড বেশী দিয়েছিলেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্‌।

লমফ্‌: আমার তো মনে হয়, সস্তাতেই পেয়েছি। ওর মত কুকুর হয় না!

নাতালিয়া : বাবা তার ফ্লাইয়ারের জন্য পঁচাশি রুবল দিয়েছিলেন আর ফ্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

লমফ্ : ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো ? কি যে বলছেন ! (হাস্য) ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো !

নাতালিয়া : নিশ্চয়ই ভালো। অবশ্য স্বীকার করছি, ফ্লাইয়ার বাচ্চা—এখনো পুরো বয়স হয় নি—কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি আর সব দিক দিয়ে। ভলচানিয়েৎস্কিরও এমন একটা কুকুর নেই।

লমফ্ : মাফ করতে হবে, নাতালিয়া স্তেপানভনা, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ও থ্যাবড়া-মুখো, আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কখখনো ভালো করে কামড়ে ধরতে পারে না।

নাতালিয়া : থ্যাবড়া-মুখো ? এই প্রথম শুনলুম।

লমফ্ : আপনাকে পাকা কথা বলছি, ওর নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে ছোট।

নাতালিয়া : বটে ? আপনি মেপে দেখেছেন নাকি ?

লমফ্ : হ্যাঁ। শিকার তাড়া করতে অবশ্য সে ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলা ওটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না।

নাতালিয়া : প্রথমত, আমাদের ফ্লাইয়ার খানদানী কুকুর হার্নেস আর চিজল ওর বাপ মা। আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমনই পাঁচমেশালি রঙ যে বলাই যায় না, ওটা কোন জাতের কুকুর। বিশ্রী চেহারা, বুড়ো-হাবড়া হয়ে গিয়েছে...

লমফ্ : ও বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু ওর বদলে আমি আপনাদের পাঁচটা ফ্লাইয়ারও নেব না... স্বপ্নেও না। ট্রাইয়ার যাকে বলে সত্যিকার কুকুর, আর ফ্লাইয়ার...কিন্তু এ-নিয়ে তর্ক করাটাই বেকুবি...আপনাদের ফ্লাইয়ারের মত কুকুর প্রত্যেক শিকারীরই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। ওর জন্য পঁচিশ রুবল দিলেও বড্ড বেশী দেওয়া হয়।

নাতালিয়া : সব কথা প্রতিবাদ করার শয়তান আজ আপনার ঘাড়ে চেপেছে, ইভান ভাসিয়েলিভিচ্। প্রথম আরম্ভ করলেন ভলোভী মাঠের উপর খামকা হক্ক বসিয়ে, আর এখন বলছেন, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের চেয়ে সরেস। কেউ কিছু বিশ্বাস করে না বললে আমার ভারী বিরক্তি বোধ হয়। যা বলেন, যা কন, আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ফ্লাইয়ার আপনার—কি যেন ওর নাম—ঐ বোকা ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে ভালো। তা হলে খামকা উল্টোটা বলছেন কেন?

লমফ্: আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নাতালিয়া স্তেপানভনা আপনি ভাবছেন আমি কানা কিংবা আহাম্মুখ। আপনি কি কিছুতেই বুঝবেন না যে আপনাদের ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো?

নাতালিয়া : মিথ্যে কথা।

লমফ্: ওটা থ্যাবড়া-মুখো!

নাতালিয়া (চিৎকার করে): মিথ্যে কথা!

লমফ্: আপনি চ্যাঁচাচ্ছেন কেন, ম্যাডাম?

নাতালিয়া : আপনি আবোল-তাবোল বকছেন কেন? পিত্তি একেবারে চটে যায়! ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে গিয়েছে আর আপনি ওটাকে ফ্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন!

লমফ্: মাফ করবেন, আমি আর এ আলোচনা করতে পারবো না। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া : আমি লক্ষ্য করেছি, যে শিকার সম্বন্ধে যত কম বোঝে সে-ই শিকার নিয়ে তর্কাতর্কি করে বেশী।

লমফ্: ম্যাদাম দয়া করে চুপ করুন···আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। (চিৎকার করে) চুপ করুন!

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন, ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে সরেস।

লমফ্: শতগুণে নিরেস। ওর এত দিন মরে যাওয়া উচিত ছিল—

ঐ আপনাদের ফ্লাইয়ারের কথা বলছি। ও, আমার মাথাটা···
আমার চোখ দুটো ··আমার কাঁধটা।···

নাতালিয়া : আর আপনাদের ঐ হাবা ট্রাইয়ারটা—আমাকে তার মৃত্যু কামনা করতে হবে না ; ওটা তো আধমরা হয়েই আছে !

লমফ্ : (কেদে কেদে) চুপ করুন ! আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না।

(চুবুকফের প্রবেশ)

চুবু : এখন আবার কি ?

নাতালিয়া : আচ্ছা, বাবা, তুমি খোলাখুলি বলো তো, ধর্ম সাক্ষী করে বলো তো : কোনটা সরেস—আমাদের ফ্লাইয়ার, না, ওর ট্রাইয়ার ?

লমফ্ : স্তেপান স্তেপানভিচ্, স্যর, আপনার পায়ে পড়ছি, মাত্র একটি কথা আমাদের বলুন, ফ্লাইয়ার থ্যাবড়ামুখো, কিংবা থ্যাবড়ামুখো নয় ? হ্যাঁ কি না ?

চুবু : হলেই বা ? যেন তাতে কিছু এসে যায় ! যাই বল, যাই কও, ওর মত কুকুর তামাম জেলাতেও একটা নেই, আর-যা-সব কি-সব।

লমফ্ : কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ওর চেয়ে সরেস। নয় কি ? ধর্ম সাক্ষী করে বলুন।

চুবু : ওরকম মাথা গরম করো না, বাছা আমার···বুঝিয়ে বলছি আমি···তোমার ট্রাইয়ারের বিস্তর সদ্গুণ আছে, কেউ অস্বীকার করবে না···জাতে ভালো, পাগুলো জোরদার, গড়ন চমৎকার আর-যা-সব-কি-সব। কিন্তু হক্ কথা শুনতে চাও, বাছা, তবে বলি ওর দুটো মারাত্মক খুঁত আছে. সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে আর তার প্যাঁচা-নাক।

লমফ্ : মাপ করবেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে···কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি সেইটে দেখা যাক···আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে

পারে. আমরা যখন মারুস্‌কিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে সমান ছুটেছিল, আর আপনাদের ফ্লাইয়ার নিদেনপক্ষে পাকি আধটি মাইল পিছনে পড়ে ছিল।

চুবু: কাউন্টের শিকারী তাকে চাবুক মেরেছিল বলে সে পিছিয়ে পড়ে।

লমফ্‌: সেইটেই তার প্রাপ্য। আর সব কটা কুকুর খেঁকশিয়ালকে তাড়া লাগাচ্ছিল আর ট্রাইয়ার জ্বালাতন করতে লাগলো ভেড়াগুলোকে।

চুবু: বাজে কথা! শোনো বাছা, আমি বড্ড সহজে চটে যাই, তাই তোমায় অনুরোধ করছি, এ আলোচনাটা থাক। লোকটা ফ্লাইয়ারকে চাবুক মেরেছিল, কারণ মানুষের স্বভাব অন্যের কুকুরের প্রতি হিংসুটে হওয়া...হ্যাঁ, পরের কুকুরকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না! আর আপনিও, স্যর, ওর ব্যতায় নন। হ্যাঁ, যেই দেখলে আর কারো কুকুর তোমার ট্রাইয়ারের চেয়ে সরেস, বাস্‌, অমনি জুড়ে দিলে কিছু একটা...আর-যা-সব-কি-সব...দেখলে, আমার সব মনে থাকে।

লমফ্‌: আমারও।

চুবু: (ভেংচিয়ে) আমারও।

লমফ্‌: বুক ধড়ফড় করছে আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...আমি কিছুই...

নাতালিয়া: (ভেংচিয়ে) বুক ধড়ফড় করছে। কি রকম শিকারী মশাই, আপনি?..আপনার উচিত শিকারে না গিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে শুয়ে আরশুলা মারা। বুক ধড়ফড় করেছে, হুঃ।

চুবু: হ্যাঁ, হক কথা বলতে কি, শিকার-টিকারে বেরোনো আদপেই তোমার কম্ম নয়। বুকের ধড়ফড়ানি আর-যা-সব-কি-সব দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খাওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে বাড়িতে বসে

থাকাই ভালো। অবশ্য তুমি যদি সত্যই শিকার করতে যেতে তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু তুমি তো যাও নিছক তর্কাতর্কি করার জন্য, আব অন্য পাঁচজনের কুকুরগুলোর সামনে পড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য আর-যা-সব কি-সব ··আমি বড্ড সহজেই চটে যাই, কাজেই এ আলোচনা বন্ধ করাই ভালো। তুমি আদপেই শিকারী নও, ব্যস্।

লমফ্: আর আপনি—আপনি বুঝি শিকারী? আপনি তো যান কাউন্টকে নিছক তেল মালিশ করাব জন্য, আর পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোটালা পাকাবার জন্য· ·ওঃ! আমাব বুকেব ব্যথাটা! আসলে আপনি কুচুটে।

চুবু: কি? আমি—কুচুটে? (চিৎকাব করে) চুপ করো!

লমফ্: কুচুটে!

চুবু: ভেড়ে, বখা ছোকরা!

লমফ্. বুড়ো হাবড়া! ভণ্ড!

চুবু: চুপ করো, না হলে আমি একটা নোংরা বন্দুক দিয়ে তোমাকে তিতিব মারার মত গুলি করে মারবো! ফক্কিকার কোথাকার!

লমফ্: দুনিয়াসুদ্ধ জানে—ও, ফের আমার হার্টটা!—আপনাকে আপনার স্ত্রী ঠ্যাঙাতো।· ·আমার পাটা···আমার মাথাটা·· চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে আমি পড়ে যাব···আমি পড়ে যাচ্ছি ··

চুবু আর যে মাগী তোমার বাড়ি চালায় সে তোমাকে চেপে রেখেছে বুড়ো আঙুলের তলায়।

লমফ্· ও, ও, ও। আমার হার্টটা ফেটে গিয়েছে! আমার কাঁধটা যে আব নেই ··আমার কাঁধটা কোথায়?···আমি মরলুম (আরাম-চেআরে পতন) ডাক্তার! (মূর্ছা)

চুবু: ভেড়ে। বকা। ফক্কিকার। আমি জোর পাচ্ছি নে। (জল পান) ভিরমি যাচ্ছি নাকি!

নাতালিয়া : শিকারী, হুঁ। ঘোড়ার উপর কি রকম বসতে হয়, তাই জানেন না আপনি। (পিতাকে) বাবা, কি হ'ল ওর? বাবা! দেখ, বাবা (চিৎকার করে) ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। তিনি মরে গেছেন!

চুবু : আমি মূর্ছা যাচ্ছি···আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস, আমাকে বাতাস দাও।

নাতালিয়া : ইনি মারা গেছেন! (লমফের আস্তিন ধরে টানাটানি) ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। আমরা কি করে বসলুম। ইনি মারা গেছেন! (আর্মচেআরে পতন) ডাক্তার! ডাক্তার! (হুল্লের মত কখনো ফোঁপানো, কখনো হাসি)

চুবু : ব্যাপার কি? কি হয়েছে? তুমি কি চাও?

নাতালিয়া : (গোঙরাতে গোঙরাতে) মারা গেছেন··উনি মারা গেছেন!

চুবু : কে মারা গেছে? (লমফের দিকে তাকিয়ে) সত্যি ও মারা গেছে। হে ভগবান, জল, জল। ডাক্তার। (লমফের ঠোঁটের কাছে এক গ্লাস জল ধরে) জল খাও! না, ও জল খাচ্ছে না··· তাহলে মারাই গেছে, আর-যা-সব-কি-সব···হায়, হায়, আমার কী পোড়া কপাল। আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলুম না কেন? এর অনেক আগেই আমার গলাটা কেটে ফেললুম না কেন? আমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? আমাকে একখানা ছোরা দাও। বন্দুক দাও। (লমফ্ একটু নড়লো) মনে হচ্ছে, সেরে উঠছে···একটু জল খাও তো, বাছা! হ্যাঁ, ঠিক···

লমফ্ : আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে···কুয়াশানাকি···আমি কোথায়?

চুবু : তুমি যত শিগগির পারো বিয়ে করে ফেলো আর জাহান্নমে যাও···ও রাজী আছে (দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে) ও রাজী

আছে, আর-যা সব-কি-সব, আমি তোমাদের আশীর্বাদ—আর-যা-সব—করছি। শুধু আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

লমফ্‌: এ্যাঁ কি! (দাঁড়িয়ে ওঠে) কে ··

চুবু: ও রাজী আছে। আবার কি হল? চুমো খাও—আর জাহান্নমে যাও।

নাতালিয়া: (গোঙরাতে গোঙরাতে) উনি বেঁচে আছেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী ··

চুবু: এসো, চুমো খাও, একজন আরেক জনকে।

লমফ্‌: এ্যাঁ, কাকে? (নাতালিয়াকে চুম্বন) আমার কী আনন্দ মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি? ওঃ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি ·· আমার হার্ট···বিদ্যুৎ···আমি কি সুখী, নাতালিয়া স্তেপানভনা··· (নাতালিয়ার হস্ত-চুম্বন) আমার পা-টা যে অবশ হয়ে গেল···

নাতালিয়া: আমি···আমিও বড় সুখী···

চুবু: ওঃ! পিঠের থেকে কী বোঝাটাই না নামলো! আহ্‌!

নাতালিয়া: কিন্তু···যাই বলো, তোমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে, ট্রাইয়ার ক্লাইয়ারের মত অত ভালো না।

লমফ্‌: সে ভালো!

নাতালিয়া: সে খারাপ।

চুবু: এই লাও! পারিবারিক সুখ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। শ্যাম্পেন নিয়ে আয়!

লমফ্‌: সে সরেস!

নাতালিয়া: ওটা নিরেস, নিরেস, নিরেস!

চুবু: (চিৎকার করে দুজনার গলা চাপবার চেষ্টাতে) শ্যাম্পেন! শ্যাম্পেন নিয়ে আয়!

যবনিকা

চাপরাসী ও কেরানী

কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা দেবার সময় পণ্ডিতজী বলেন, চাপরাসীদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশী, কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা। আমার ঠিক মনে নেই। তার জন্য 'পণ্ডিত সম্প্রাদায়' আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজীর সব কথা, বিশেষ করে তাঁর সব শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারে নি, পণ্ডিতজী স্বরাজলাভের উষাকাল প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওইভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। কারণ আমার জীবন-সায়াহ্ন আসন্ন।

অতএব, পণ্ডিতজী প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃ-স্মরণীয় নয়।

খয়ের। বাংলা 'খয়ের' নয়, উর্দু 'খয়ের'। তার অর্থ 'তা সে যাকগে।' এই উর্দু 'খয়ের'টি এই বেলাই একটু ভাল করে শিখে নিন। বিস্তর 'ফায়দা ওঠাতে' পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। 'আমরা খেতে পাই নে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়, ডাক্তারবদ্যির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমরা তখন উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবার বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এ সব বালাই-আপদ দূর করার জন্য কী সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে,

এইবারে' আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোন কিছু।

বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য নৈস্তব্ধ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবাব শুনতে পাব, 'চাপানে'র 'ওতর', এইবারে শুরু হবে উল্টো 'বারমাস্যা', এইবাব আবম্ভ হবে আমাদের আশাব বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি! কোথায় কী?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন সেটি 'খ য়ে র।'

মানে? এর অর্থ টা ত তাহলে বুঝতে হয়। কারণ ইতিমধ্যে বক্তা 'জাপানের ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জান্‌জিবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ওই 'খয়ের' শব্দে তাবৎ সমস্যার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওঁ-তে যে রকম হিন্দুর ব্রহ্মা লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীশ্চানের গড লাভ। 'সকলং হস্ততলং শব্দ মাত্রেণ যদি অর্থধনং কোঽপি লভেৎ।'

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গুহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে হার্টটি দেখিয়ে নিন। শক্-টি মারাত্মক রকমের হবে। ছাপাখানায় সদ্‌ব্রাহ্মণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রুফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোক-সভায়ও আমার ঠাঁই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাক্‌গে— অন্য কথা পাড়ি।' অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যে সব দুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম্‌-বাগড়ম্‌ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না! আপনি এখন কালীঘাট, মৌলা আলী সর্বত্রই লম্ফ-ঝম্ফ দিতে পারেন। কারণ, 'খয়ের' শব্দেব প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়ের' বাক্যের শব্দার্থ আরবী ডিক্‌শনারি• ঘেঁটে বের করেও

পুলি-পিঠের স্যাজ গজাবে না। ওতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়ার দিকে ফুল্লরার বারমাস্যা গেয়েছিলেন সেটা 'ভাল'?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরাও এ-রকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদের পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর সুদীর্ঘ অবতারণা করার পর সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয়, 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভাল জিনিস'—তার সরল অর্থ, 'এ-দিককার কথা বলা হল, এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করছি এবং সেইটেই আমার বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নের সমাধান, রহস্যের মীমাংসা।'

'খয়ের'-এর এরূপ ব্যবহারকে ফার্সীতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'—'কথার' (কালামের) 'বালিশ' (তাকিয়া)। অর্থাৎ যে-কথার উপর ভর করে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। বিপক্ষ রা'টি কাড়তে পারবে না, আপনি কেল্লা ফতেহ্ করে দিয়েছেন, ভাগ্যিস, আপনি, মোকামাফিক 'খয়ের' শব্দটি প্রয়োগ করতে জানতেন. 'রাখে খয়ের মারে কে?'

মুসলমানরা নাকি এদেশের মন্দির ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিক্-কাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নূতন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেয়াল আমদানি করে ধ্রুপদ-ধামার বরবাদ করেছে। করেছে তো করেছে. তাই বলে কি উষ্মাভরে গোস্সা-ঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন? গড়ের মাঠে গিয়ে রাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালী কেরানী সরকারী ইশ্‌তিহার পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুধিয়েছিল 'আমাকেও লোষ্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, স্যার?') কী ভাবে 'খয়ের' শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হয়, সেটি শিখবেন না? ওইটে ঠিকমত, ভাগমাফিক, বাংলায় 'এস্তেমাল' করতে পারলে পাড়ার তর্কবাগীশ, তাকিয়া (-ই-কালামের)-র কল্যাণে তর্কবালিশ হতে কতক্ষণ?

চিন্তা করে দেখুন, 'খয়ের' শব্দের কত গুণ। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তাঁর শব্দভাণ্ডার থেকে লাথি ঝাঁটা মেরে তাবৎ আরবী-ফার্সী শব্দ বের করে দিচ্ছেন—কারণ হিন্দী বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কিনা—কিন্তু কই, 'খয়ের' শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব তো কেউ করে না। কট্টর কান-ফাটা হিন্দীতে 'ভারতওয়ার্ষিক চন্দ্রিকা ঔর সোওয়াধীন্তা, গঁড়তন্তর ঔর সামওয়াদ' ইত্যাদি ইত্যাদি 'কঠন কঠন' (কঠিন কঠিন) সমস্যার্থে নির্মাণ করার পর সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন কোন মোহমুদগরে? সেই সনাতন—খয়ের। খয়ের—সেই যাবনিক, ম্লেচ্ছ খ-য়ে-র দ্বারা। এবং সেই 'খয়ের' এর 'খ'ও উচ্চারণ করেন আসল ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড় মসজিদের সামনে জাকারিয়া স্ট্রিটে কাবুলীওলা 'খ' উচ্চারণ করার ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তার কাছে স্কচ 'লখ্' শব্দের 'খ', জর্মন 'বাখ্' শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন?

মুসলমানরা মন্দির ভেঙে অশেষ অপকর্ম করেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে 'খয়ের শব্দের যে কাঠ বালাখানা তৈরি করে দিলে তার উপরে বসে হাওয়া খাবেন না?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভাল দিকটা দেখবেন না?

তবে একটা গল্প শুনুন

হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তার অপরাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি?

খয়ের।

গল্পটা কামিয়ে-সামিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক ভদ্রসন্তানের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পুজো-পাটা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা

ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া একখানা খাসা তিলক কেটে দিলে। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কণ্ডক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই ভক্তি হয়। গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে 'তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা' ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারে কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হবি ত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল বাহাবে একখানা 'বার'। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জব্বর পরব ছিল বলে 'ইস্পিশেল' কেস হিসাবে 'বার' খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধমের কাহিনী শোনাই কী করে? কিন্তু তাঁরা যখন এতাবৎ এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল ভাঁড়ের মা-কালীর মস্ত জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত দুটো বুনো ফড়িং নিজেই ধরে খেতে রাজী হবেন—এই আমার ভরসা।

পাঁট। ইংরেজীবাগীশ ছোড়ারা বলে 'পাইন্ট'। তিন কোয়ার্টার খেতে না খেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়ার্টারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে—বোতলবাসিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাফকে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, ওই 'ব্যাড' কোয়ার্টারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে

বেরন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেন নি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, 'পাষণ্ড মাতাল।'

পকেটে বোতল থাকলেই, এমন কী সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মানুষ মাতাল হয় না, কিন্তু মৈত্রমশাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করতেন। শাস্ত্রে আছে,—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখে নি।

অতএব, দেবদত্ত রাত্রে খায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনফারেনস্।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু দ্রব্যগুণ অনস্বীকার্য। বেদনাভরা কণ্ঠে, গদ্‌গদ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে, 'মৈত্র মশাই, বোতলটাই শুধু দেখলেন, ছিপিকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুর্শিদ আমাকে দেন নি। আমি বিদূষক, যা পারি তাই দি। তাঁরা হয়ত বলবেন, এ-গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাদের জন্য একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। ইটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানের গল্প। কুট্টি বসে আছে ছ্যাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। বাবু জামাজোড়া পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে পৌঁছলেন নিচে। তিন লম্ফে কুট্টি কোচবাক্স থেকে

নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে কয়, 'অহো-হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইহানে লাগছে, এ হে হে-হে, ওইহানে লাগছে।' গা বুলোয় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলোয়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্তা আইছেন জল্‌দি।'

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছে সেটা দেখছ না।

কিন্তু কেরানী আর চাপরাসীদের কী হল?

খয়ের।

চাপরাসীদের মাইনে কোতওয়ালের মত হোক সেই আমার প্রার্থনা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীদের কাছে নিবেদন, কোতওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাসীদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার বাসনা, সকলেরই যেন কোটালের মাইনে হয়—অর্থাৎ আই. জি.-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে—এই হল সত্যকার প্রার্থনা। ঋষি যখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিস্টও ওই আদর্শের জন্য লড়ে। পেঁত্তিরা বলে, 'মজদুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রুপোর সানকি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে এবং আর সবাই রাস্তায় পাথর ভাঙবে।' এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানাবার জন্য আমি এ-প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারী দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই। কেন নেই, সে

কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৪৭ সনের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সনের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা, আণ্ডাওলা আর থাকবে না—এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাসী চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ৯৫, মাইনে পায়। কেরানী বোধ হয় ১১৫, পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না — তবে অনুপাতটা মোটামুটি এই। অঙ্কশাস্ত্র এস্থলে বলবে, 'অতএব চাপরাসী কেরানীর চেয়ে বিশ টাকা কম পায়।' ওই করলেন ভুল। শুনুন।

আপনি চৈতরামকে ঘন্টি বাজিয়ে বললেন, 'যাও তো চৈতরাম, এক প্যাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।'

সরকারী আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারী কাজের জন্য। আপনার জন্য সিগরেট আনা সরকারী কাজ নয়।' আপনি কিছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। শব্দগুেই বলবে, 'বহুৎ (উচ্চারণ 'বোহৎ) আচ্ছা, হুজুর।' এবং লম্ফ দিয়ে এমন তীরবেগে বেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট!'

এক মিনিটের ভিতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগারেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসাবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগারেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা। ঠিকমত নোটিস

দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবরনী সিগারেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল শুদ্ধমাত্র এঁম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারী চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকার আপনাকে ছুড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগারেট বিক্রিতে দোষ কী? কিছু না। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, তার ব্যবসা বাড়ুক।

কিন্তু কেরানা এ-ব্যবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, এ-কথা এখন আর তুলবেন না। সিগারেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানীর মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ্য করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলাতি করে নি। একদিন আমি তাকে শুধালুম তার ইনসম্নিয়া আছে কিনা। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, 'না।' হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তার ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদুহাস্যের রেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, 'ব্যাপারটা কী?'

নাঃ। চৈতরাম প্রতি রাত্রে অভিসারে বেরয় না—যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বৃন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাঃ। 'বৃন্দাবনকে কুন্জ্-গলিয়ে শ্যামরিয়া কা দরসন' ইত্যাদি যাবতীয় সমুদয় ব্যাপার সে মায়ের গব্ব থেকেই শুনে আসছে, ও-সব রোমান্সে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।

সে করে অতিশয় গদ্যময়ী ব্যবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভিতর ওই কম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারী চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোনও দ্বন্দ্ব বাধে না। দুধের ব্যবসাও আটটার ভিতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তাও করেছে। এখন নাকি ভাবছে,

দুটোই কম্বাইন করা যায় কিনা। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু গুস্বি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, 'চোর ভাগা কিও ?' দরওয়ান বললে, 'মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুস্‌রেমে ঢাল. পকড়ে কৈসে ?' চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। পাব এক হাথমে দুধ, দুস্‌রেমে পাইপর (পেপার) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানী বেচারী ত আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে ? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে-কথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলক্ষণ জানি—বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুরে একটাও যোগাড় করতে পারি নি। অধম কুলীন সন্তান—এর চেয়ে অনেক আনায়াসে পাঁচটি বিয়ে করতে পারতুম। চারটি আইনত—'হিন্দু কোড-বিল' আমার উপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বলবেন, 'স্যর, আপনি যে চাপরাসীদের য়ুনিফর্মের জন্য দরদ দিয়ে পার্সনাল ইনট্রেস্ট নেন, সে বড় ভাল কথা। কিন্তু স্যর, এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেড়ে বাইসিকলের সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাসীদের পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকাল বেলা কে কোন ব্যবসা করে।'

ভুলে গিয়েছিলুম, য়ুনিফর্মের সাফসুতরায়ের জন্য চৈতরাম সরকারের কাছ থেকে 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্‌' পায়। অবশ্য একদিন ক্যাসওয়েল লীভ নিলে সেদিনের জন্য অ্যালাওয়েন্‌স্‌টি কাটা যায়। অ্যাকাউন্টেন্টের অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতা কর্মে—আপনাদের মোটা মাইনের হিসেব রাখতে নয়। এই 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্‌ শীট'খানা

ঠিকমত টানতে পারেন ক'টি ঝানু অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গেছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসসুদ্ধ সবাই অডিটার-জেনারেলের কাছে কী হুড়োতাড়াই না খেয়েছিলুম। শনিবার হাফ ডে—অ্যাকাউন্টেন্ট হাফ ওয়ার্কিং চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক এখন তা শুনে বলেন, সরকারী পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই এখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য 'দামোদরে' কত লক্ষ টাকা কোন দিকে ভেসে যায়, সে কথা আমি বলতে পারব না, তবে এ কথা আমার কলম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, তাঁবা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে বলব, সরকারী কোষাগার থেকে লক্ষ্মী পালিয়ে পড়ে এই 'ওয়ার্কিং' শীটে'র দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গা ঘেমে জেগে উঠি গিন্নী জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত 'ওয়ার্কিং' উচাটন' আওড়ান।

কেরানী ওয়ার্কিং অ্যালাওয়েন্স পায় না। যুক্তি হল, সেই একই ওয়ার্কিং অ্যালাওয়েন্স হয় না [illegible] শত্রুবোধ [illegible]। অর্থাৎ তার ঠাট বজায় রেখে দফতরে আসতে হয় বুশশার্ট ইস্ত্রি না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট লিখে, 'শ্যাবি।' আপনি হয়ত বলবেন, এই ওয়ার্কিং অ্যালাওয়েন্স আর ক পয়সার ? বটে। দু পয়সা হোক আর ছ গণ্ডাই হোক দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে, ছ পয়সা কামাতে কতক্ষণ লাগে।

অন্ত যখন। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে—চাপরাসীরা বর্ষায় ছাতা এবং বর্ষাতি পায় মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও-দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজে যায় তবেই তো চিত্তির একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানী পায় না। যদিও সরকারী কাজে তাকে এ দফতর ও-দফতর করতে হয়—বগলে ফাইলও থাকে। কেরানীরা সচরাচর চাপরাসীর ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানী ছাতাখানা হারিয়ে ফেলে। চাপরাসী বলে 'ছাতা কিনে দাও।' সরকারী ফাইল বাঁচাবার প্রেমে নয়, তুধ বাঁচাবার জন্য। কেরানী বলে, 'সরকারী কাজে খোওয়া গিয়েছে, ওটা 'রাইট অফ' হবে।' তুধের স্মরণে উপদেশ দিয়েছিল, 'শা বেরবার সময় তুধে জল দিস্ নি, বৃষ্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।' শেষটায় কী হয়েছিল, জানি নে। সি. সি. বিশ্বাস মশাই বলতে পারেন। তখন আইন মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

চৈতরাম শীতকালে কম্বল পায়। কেরানী পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার-ব্যাণ্ডে। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখানা ঘর। একফালি বারান্দা। এক ভুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশ্তা খাবার খায়-টায়। চৈতরাম তুখানা ঘর পেলে বড় ভাল হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে! উঁহু। তুখানাই ভাড়া দিতে পারত বলে তাই চণ্ডীগড়ের নূতন ক্যাপিটালে তারা তুখানা ঘরের জন্য আবেদন-আন্দোলন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর দিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানীও পায়—যাদের সত্যকার মুরুব্বির জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? বারান্দায়? মুশকিল।

এই ত গেল মোটামুটি জরিপ। তার উপর পুজো-আর্চায় বখশিশটা-আসটা। কোনও জিনিস বড় সাহেবের জন্য কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা ফেরত চান? কেরানী এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই ত পাগল সারে।

কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসা করে। এটা সবিস্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানীরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং আপনি খুশী, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলীওলাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কষ্ট দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাসী ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

জনৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহাম্মুক জামাই শ্বশুরকে শোধাচ্ছে, সস্তুরমশাই, সস্তুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যা।' (মনে মনে, 'ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোত্থেকে?')

'কার সঙ্গে, সস্তুরমশাই?'

রাগত কণ্ঠে, 'তোমার শাশুড়ী সঙ্গে।'

জামাই, গদ্গদ কণ্ঠে, 'আহাহা ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।'

দফতরের ভিতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

* * *

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে। অবশ্য চাপরাসীদের মত টায় টায় এরকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেন্ট উচ্ছুগ্গো করাতে তাঁরা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন॥

শপথ করিনু রাত্রে পাপপথে আর যেন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি শপথঘ্ন মধুঋতু কি করি উপায়!

—হাফিজ

দেহলি প্রান্ত

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লিতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয় মুখো রওয়ানা দেন। এমন কী সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি।

তবে কি যাঁরা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই দুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলফাজমানেওলা, সেক্রেটারি-অয়েন্ট-লসস্, আণ্ডার-তস্য আণ্ডারকাভার, জাত-বেজাতের-কর্মচারী-কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরশুরামী' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে পারুক আর নাই-পারুক, তাকে অন্ততপক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে, বেরিয়েই অন্য নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে ঘোলা জল খেয়েছি—এ কথাটা আপনারা প্রায় আপ্ত বাক্য রূপে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মত শেষ একটা (না, দু-তিনটে) সিগারেট খাওয়ার হুমকি দিচ্ছি সে শুধু তাঁদের আপন জন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা প্রধান বক্তা কোন আণ্ডার সেক্রেটারির নেমন্তন্ন পেয়ে শেষ-মুহূর্তে

কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিলে) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, যখন সেক্রেটারিদের মন্তব্য করে কাব্য পড়ে শুনালুম—আপনারা সভয়ে গোপনে একে একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস করে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (মাসাজ ইনস্টিটিউট নয়), খুলেছি, কিছু না পেরে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোঁড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্তারা বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনাট্যম না চ নি—তাহলে বোধ হয় আপনারা হনুমানের ছবি এঁকে তার গলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে 'নর সং দাস' প্রাইজের বদলে সেই প্রাইজ দিতেন

তবু আমি আপনাদের উপর এক ফোঁটাও রাগ করি নি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংস্রবে না এলে এই যে সাহিত্যরচনার মামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে ক ক স্মনকালেও নামত ?

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখামাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়ত 'কাক্কুৎ ঘাড় বেঁকিয়ে 'এই যে', বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবে, 'এই রে, আবার এসেছে' বলে দুদ্দাড় করে দরজা জানালা বন্ধ করবেন না।

বাংলাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাঞ্জিলালকে 'অবদান করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচ করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক, আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে বদলি না হয়—ছোকরা তাহ'লে তবিল তছরুপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

"যতই ভাবছি, ততই দেখি দিল্লি খারাপ জায়গা নয়

দিল্লির গরম অসহ্য! কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো যমুনার ওপার থেকে দূর-দিগন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মন্ত্রের মত গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরিষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গোণেন, আপনার ত্রিযামা যামিনীর সখা তারার দল একে একে ম্লান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর ঘড়িটা আবার তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সঙ্গসুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এস্পার-ওস্পার ছিঁড়ে-ফেড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম-প্রাসাদের চূড়ো, বাশান রাজদূতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বুকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তারপর সবশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়—তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটি পর্যন্ত করেন না, ভিজে মাটির গন্ধ দিয়ে বুকের রন্ধ্র ভরে নেন, ইতিমধ্যে শুনতে পান—আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দরোয়ান রামলোচন সিং তুলসীদাসকৃত রামায়ণ সুর করে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যই খুব মন্দ জায়গা?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধ্যের পর আপনাকে না বেরতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন…

এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন? সকালবেলায় সোনালী রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে

উঠল, নাকে টোস্ট স্যাঁকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে, এইবার ছ্যাঁৎ করে ডিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

আহা! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহ-চিক্কণ আলিম্পন, আপনার আমার মত গরিবের ফালি অঙ্গনটুকু নন্দনকানন হয়ে উঠল—আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বর্ণরৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কম নয়॥

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হতে শতবর্ষ পরে
ন। নাবী গলবদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
[illegible]নিয়া অবাক হবে কী করে যে হেন ইন্দ্রজাল
[illegible]ভূমে সঞ্চারিল। পরাধীন দীন দগ্ধ ভাল
বঙ্গভূমি। [illegible]বি তথা বিনাশিতে উদিল যে রবি
স্বদেশে একলা সে যে। বঙ্গ কবি হল বিশ্বকবি।
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি মানিবে বিস্ময়
কোন পুণ্যবলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়

প্যারিসে রেস্তোরাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা; যাদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসী কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কার্ত্তিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন; কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসীটা বলতে পারেন তো? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম, 'ফরাসী ভাষাটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি কিনা বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি। আবার যখন ল্যাণ্ডলেডি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গসুখলিপ্সু।

ফরাসী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভালো জিনিস।

বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে? আমি যে ফরাসী সে তো আর বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারি নে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি 'জার্নালিস্ট' তাহলে তার মানে কি হল?'

এক গাল হেসে বললুম, 'তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু, হল না। ঠিক তার উল্টো, আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি 'আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে' তবে তার মানে কি?'

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না, বললুম, 'তার মানে 'আরেকদিন দেখা হবে', এতে অস্পষ্টতাটা কোথায়?'

বললেন, 'ফেল! তার মানে হল, 'আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন'।'

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও যখন বাঙলায় বলি, 'এবার তুমি এসো' তখন তার অর্থ 'তুমি এবারে কেটে পড়ো'।''

'ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম আমি জার্নালিস্ট, কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই

'এই মকুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাইটে রাজনৈতিক মসিয়ো অমুক্ত একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তার সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে— কোথায় জানি নে গির্জে মেরামত করতে দিয়েছেন, কোন সেণ্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন, এইরকম ধারা কত কি। আমি খবরটা শুনে বললুম, 'বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি'।'

'করলুম কি, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে করে

খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়টে কবে ক'দিন ক'রাত্তির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, 'নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই; তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না'।

'অনুস্বার জহুরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখেই বুঝলেন আমি কাঁচা নই।'

তারপর বললেন, 'লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে, এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিটখানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্লেক-মেলিং হল না?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ 'না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট'। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম॥

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, খেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দ ঘন।

(শ্রমণ রিয়োকোয়ান)

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এ'দিকে আপনার জাহাজ অতি ধীর মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সঈদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড় যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সঈদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে সেই সঈদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন — ফালতো কোনো খরচ লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর শহরের কিছুই দেখা হয় না— আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বলবেন, ঘটা দশেকের জন্য কাইরোতে ওরকম ধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোনো লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বল্লুছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারবেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজ যত তফাতই থাক না কেন, তবু তো তারা আপসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাকা একটি বচ্ছর। অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস

শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসত আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটস্য লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে 'গঙ্গাস্তান' যখন হয়ে ওঠে নি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি :—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক্। সভাপা, পিরামিড এ সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে হা হা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডার তত্ত্বই করে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতীবাগান, শ্যামবাজার। ওসব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দেই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে স্বর্গসুখ অনুভব করি আর ডাজব-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গাম্য তা এ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবুল-বসন্ত-রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘনিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কাফেখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত-

রেস্টুরেন্টেরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুররিয়ালিস্টিক ছবির মত এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়। অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত-রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সকলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজিন্ ইংরিজী সব কিছু জড়িয়েমড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম, পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালা-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না। আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি

পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবে নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধুবান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরঞ্চ ফেরি-ওলাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

একপ্রস্থ সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল ডাক দিতেই সবাই 'হাঁ, হা করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন। 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরা ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু' আনা লাভ, অথবা কুইট্স।' তারপর আড্ডা আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। আর কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ। সে কী অসম্ভব দর-দস্তুর, বকাবকি,—শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিশে দেব!' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারেলনে এর চেয়ে বেশী দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানায় নি,

বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেনথে হাজির। আমি কাফের পিছনে কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতী বাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে? ওকি পাতলুন না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম?' ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরী হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কাফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন কাফেতে যাই, গুণীরা তারিফ করেন।

কয়লাওয়ালার দোস্তী? তওবা!
ময়লা হতে রেহাই নাই।
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

বড়দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পুব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডিয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন ? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগ্‌দত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার পশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন--প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন।' তারাও এসে দেখে, গাধা-খাচর, খড় বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজা-ধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

*   *   *

বাইরের থেকে গানের গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।

কত নারী পুরুষ ছিলেন আন্দাজ-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন তার দুদিকে সিল্কের চকচকে দু ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার—ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্ট্‌ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি;

কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বানিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক-স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্‌স্ কোট'—সিক্‌স্-সিলিণ্ডারী অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কারো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়-করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালী জরির কাজ। হীরের আটটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্পশু—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে? না, হাতে কিচ্ছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরকণ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ি? জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দেকোল্‌তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেম সাহেবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত

বাঁধা হোমিওপ্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন; 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্ত-রাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপ্‌টার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ী শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোট ছোট বোটাদার। বেনারসী-ব্যাপার। সেই কাপড় দিয়ে ব্লাউজ—জরির বোটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকালবেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুছিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউ-খেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা।

শাড়ি ব্লাউজের কন্‌ট্রাস্‌ট্‌ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কন্‌ট্রাস্‌ট্‌-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নিচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালী মেয়েব বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হাটগেলেব ভিতর এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টাকি পাখিরা রোস্ট হয়ে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ' জনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মন কিলবিল করছে ইতালির মাকরোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আঙাব বাগান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোর ব্রিটিশ মাযোনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিক-কাবারের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মূলোর আলপনা, গরম-মসলার কাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসজের ডজন ডজন কুতুবমিনার।

কনট্রাস্‌ট্‌, কনট্রাস্‌ট্‌, সবই কনট্রাস্‌ট্‌।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব শ্যাম্পেনে টাকিতে ॥

> করি শেষ সোক্রোতেস যৌবনের পঞ্চাশ বৎসর
> উদ্বাত হইয়া প্রৌঢ় তোলে তার প্রীত কণ্ঠস্বর
> দেবালোকে সম্বোধিয়া 'হে অমর্ত্য সুরলোকবাসী
> লহ মোর ধন্যবাদ। আসঙ্গ লিপ্সার মোহ নাশি
> দিয়েছ যে শান্তি হৃদে তারি তরে জানাই প্রণাম,
> এইবারে দেবগণ পূর্ণ কর শেষ মনস্কাম—
> এই যে দেহের রক্তে এখনো রয়েছে যৌন-ক্ষুধা
> নির্মূল করিয়া ফেলো, পাবো শেষ শান্তিরস সুধা।'

মার্জারনিধন কাব্য

কোন্ দেবে পূজা করি কোন শীর্নী ধরি ?
গণপতি, মৌলা-আলা, ধূর্জটি শ্রীহরি ?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শীদ মস্তান্
কোম্পানি কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিয়া—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে ॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোনো সাধুজন
বেহদ্ রঙান কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এস্তার আলম পারে করিলে খেয়াল
রোশনী আসবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদি কেচ্ছা তবু হরকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ রমণী
হয়া বড়, ইয়া চড়, নানা গুণে গুণী
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায় ॥
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোকে তারীফ বাখানে।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ি তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এস্তারে এস্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দানে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে।
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেশালা বদখদ্
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ?
দুলহা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রাজ আর আজরবৈজান
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"

ছুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

মজলিস জৌলুস করি ছুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা ছুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।
পযজারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুঁপসারে শুনে পুণ্যবান ॥

।ওনমাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে ছু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি সিনা কলিজায়
মরি মার মেলামেলি করে ছুজনায় ॥

"তোমার মাথায় টাক নাই কেন ?"
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো ভাই ?"
কাঁচুমাচু হঁয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি ?"
"আরে ছুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি.বটি ?

ধাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরক্তিব কাহারে কয়
আজব তুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
থাপটা না ভুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফাল্যাইন্থ কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
ভবিষ্যৎ আগুনে গড়া।'
তার পর কার ঘাড়ে তুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি। ••

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পৌঁছি গেলা ঘর।

মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্‌যা হুঙকারিয়া কয়
"তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুঁশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।"
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ, শাবাশ॥

হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ,
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বাঁবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতা দাড়ি ছিঁড়ে কয়
"তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ।
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগো পুণ্যবান॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝড়ে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাঁড়ি
ফিরোজ পৌঁছিল শেষে মতীনের বাড়ি।

কাঁদিয়া কহিল "ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় ভাঁই।"
বণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।
বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছ" কয়, "নাই গো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসল এলেমে তুমি করো নি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল"
বাণীরে বন্দিয়া বান্দা বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মল্লিনাথস্য

স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মার নি এখন তাই কর হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল॥ *

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তর বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুর্বে কুশতন, শব-ই-আওওয়ল'। অর্থাৎ গুর্বে=বিড়াল, কুশতন্=মারা, শব=রাত্রি, আওওয়ল=প্রথম। সোজা বাঙলায়, পয়লা রাতেই মারবে বেরাল।'

ভবঘুরে

ছন্নছাড়া, গৃহহারা, বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, যাযাবর—কত হরেকরকম রঙবেরঙের শব্দই না আছে বাঙলাতে 'ভ্যাগাবণ্ড' বোঝাবার জন্য। কিন্তু তবু সত্যিকার বাউণ্ডুলিপনা করতে হলে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা--গেরুয়াধারণ। ইরান-তুরান-আরবিস্থানে দরবেশ সাজা। ইয়োরোপে এই ঐতিহ্যমূলক পরিপাটি ব্যবস্থা না থাকলেও অন্যান্য মুষ্টিযোগ আছে যার কৃপায় মোটামুটি কাজ চলে যায়। সেগুলোর কথা পরে হবে।

তবে এই সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করার আগে একটুখানি ভেবে-চিন্তে নেওয়া দরকার। একটি ছোট উদাহরণ দেই।

আমি তখন বরদায়। বহু বৎসর আগেকার কথা। হঠাৎ সেখানে এক বঙ্গসন্তানের উদয়। ছোকরা এম-এ পাস করে কি করে সেখানে একটা চাকুরী জুটিয়ে বসেছে—মাইনে সামান্যই। কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন কেটে যায়।

ছোকরা আমাদের সঙ্গে মেলেমেশে বটে কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল পর্যন্ত তার পাত্তা পাওয়া যায় না—অথচ ঐ সময়টাতেই তো চাকুরেদের দহরম-মহরম, গাল-গল্প করা, বিশেষ করে যখন বিনয়তোষের বাড়িতে রবির দুপুরে ভূরি-ভোজনের জন্য তাবৎ বাঙালীর ঢালাও নেমন্তন্ন। অনুসন্ধান না করেই জানা গেল বাঁড়ুয্যে ছোকরার দু-পায়ে দুখানা এ্যাব্বড়া বড়া বড়া চক্কর। শনির দুপুরে আপিস ছুটি হতে না হতেই সে ছুট দেয় ইস্টিশান পানে। সেখানে কোনো একটা গাড়ি পেলেই হল ... টিকিট মিন-টিকিটে চল্‌লা সে ইঞ্জিনের এক-চোখা দৃষ্টিতে সে যেদিকে ধায়।

পূর্বেই বলেছি, এহেন সৃষ্টি-ছাড়া কর্মের জন্য সন্ন্যাসী-বেশ প্রশস্ততম। হিন্দু-মুসলমান টিকিট-চেকারের কথা বাদ দিন, সে যুগের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দুঁদে চেকার পর্যন্ত মিন্-টিকিটের গেরুয়াকে

ট্রেন থেকে নামাতো না—বিড়বিড় করতে আমিই একাধিক বার শুনেছি, 'গড্ ড্যাম হোলি ম্যান—নাথিং ডুয়িং'। অর্থাৎ 'ওটা খোদার খাসী, কিচ্ছুটি করার যো নেই।'

আমাদের বাঁড়ুয্যে ছোকরাটি অতিশয় চৌকশ তালেবর। দু'টি উইক-এণ্ডের বাউণ্ডুলিপনা করতে না করতেই আবিষ্কার করে ফেললে এই হৃদয়-রঞ্জন তথ্যটি। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের চক্কর দুটি টাইম-পীসের ছেঁড়া স্প্রিং-এর মত ছিটকে তার পা দুটিকেও ছাড়িয়ে গেল। বিশেষ করে যেদিন খবর পেল, সৌরাষ্ট্রের বীরমগাম ওয়াচওয়ান থেকে আরম্ভ করে ভাওনগর দ্বারকাতীর্থ অবধি বহু ট্রেনে একটি ইস্পিশেল কামরা থাকে যার নাম 'মেণ্ডিকেন্ট কম্পার্টমেণ্ট', গেরুয়া পরা থাকলেই সে কামরায় মিন্-টিকিটে উঠতে দেয়। সেখানে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীরা আপোসে নির্বিঘ্নে আত্মচিন্তা-ধর্মচিন্তা পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করতে পারেন। তবে নেহাত বেলেল্লা নাস্তিকদের মুখে শুনেছি সেখানে নাকি বিশেষ এক ধোঁয়ার গন্ধ এমনই প্রচণ্ড যে কাগেবগে সেখান থেকে বাপ বাপ করে পালায়—দুষ্টেরা আরও বাঁকা হাসি হেসে বলে আসলে নিরীহ প্যাসেঞ্জারদের ঐ কৈবল্য ধুম্রের উৎপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ খয়রাতী মেণ্ডিকেন্ট কম্পার্টমেণ্টের উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের বাঁড়ুয্যে তার খোড়াই পরোয়া করে। আসলে সে খাস দর্জিপাড়ার ছেলে, বাবা,—ছোকরা বয়েস থেকে বিস্তর ইটালিয়ান অর্থাৎ (ইটের উপর বসে) ছিলিম ফাটানো দেখেছে, দুচার কাচ্চা যে নাকে ঢোকে নি সে-কথাও কসম খেয়ে অস্বীকার করতে সে নারাজ। দুআভুআ না করে বাঁড়ুয্যে তদ্দণ্ডেই ধুতিখানি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে মাদ্রাজী প্যাটার্নে লুঙ্গিপানা করে পরলো, বাসন্তী রঙ করাতে গিয়ে গেরুয়াতে জাত্যান্তরিত তার একখানি উড়ুনি আগের থেকেই ছিল। 'ব্যোম ভোলানাথ' বলতে বলতে বাঁড়ুয্যে চাপলো 'মেণ্ডিকেন্ট কম্পার্টমেণ্টে'। বাবাজী চলেছেন সোমনাথ দর্শনে।

আমাদের বাঁড়ুয্যে কিপ্‌টে নয়। মিন্‌-টিকিটে চড়ার পরও তার ট্যাঁকে ছুঁচোর নেত্য। তাই আহারাদিতেও তাকে হাত টেনে হাত বাড়াতে হত পয়সা দিতে। তাই ঐ ব্যাপারে রিট্রেঞ্চমেন্ট করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো আরেকটি তথ্য—পুরী-তরকারী, দহি-বড়া-শিঙাড়ার চেয়ে শিক-কাবাব ঢের সস্তা, পোষ্টাইও বটে। এক পেট পরোটা-শিককাবাব খেয়ে নিলে শুবো-শাম ত্রিযামা-যামিনী নিশ্চিন্তি।

'গোস্ত-রোটী কাবাব-রোটী' যেই না ফেরিওয়ালা দিয়েছে হাঁক, অমনি বাঁড়ুয্যে তিন লম্ফে দরজার কাছে এসে তাকে দিল ডাক। লোকটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।—আসতে চাইল না। বাঁড়ুয্যে ঘন ঘন ডাকে, 'আরে দেখতে নাহী পারতা হায়, হাম তুমকো ডাকতে ডাকতে গলা ফাটাতা হায়—' সে-হিন্দীকে রাষ্ট্র-না বলে 'লোষ্ট্রভাষা' বলাই উচিত। এক একটি লব্‌জো যেন ইঁটের থান।

ফেরিওলা কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে হিন্দী গুজরাতীতে বুঝিয়ে বললে, 'সাধুজী, এ তোমার খাওয়ার জিনিস নয়।' বাঁড়ুয্যে গেল চটে। সে কি এতই অগা যে জানে না, শিক-কাবাব কোন্‌ অখাদ্য চতুষ্পদ থেকে তৈরী হয়। তেড়ে বললে, 'হাম ক্যা খাতা হায়, নাহী খাতা হায়, তোমার ক্যা ভেটকি-লোচন?' ফেরিওয়ালা তর্ক না করে, স্পষ্ট বোঝা গেল অনিচ্ছায়—কাবাব-রুটি দিয়ে পয়সাগুলো না গুনেই থামাতে ফেলে চলে গেল।

ট্রেন ছেড়েছে। বাঁড়ুয্যে কাবাব-রুটি মুখে দিতে গিয়েছে—লক্ষ্য করে নি, কামরার থমথমে ভাবটা। এমন সময় দশটা হেঁড়ে গলায় একসঙ্গে হুঙ্কার উঠলো, 'এই শালা, ক্যা খ্যাতা হৈ?'

প্রথমটায় বাঁড়ুয্যে বুঝতে পারে নি। আস্তে আস্তে তার চৈতন্যো-দয় হতে লাগল—সন্ন্যাসীদের প্রাণঘাতী চিৎকারের ফলে।

শালা পাষণ্ড, নাস্তিক। অখাদ্য খায়, ওদিকে ধরেছে গেরুয়া। চোর-ডাকাত কিংবা খুনীও হতে পারে। ফেরার হয়ে ধরেছে ভেক।

এই করেই ত সাধু-সন্ন্যাসীদের বদনাম হয়েছে, যে তাঁদের কেউ কেউ আসলে ফেরারী আসামী।

বাঁড়ুয্যে কি করে বলে, সে জানতো না ওটা অখাদ্য। একে মাংস, তায়—। ওদিকে ওরা ফেরিওলাদের বাঁড়ুয্যেতে যে কথা কাটাকাটি হয়েছে সেটা যে ভালো করেই শুনেছে, তাও ওদের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল।

ওদিকে সন্ন্যাসীরা একবাক্যে স্থির করে ফেলেছে, এই নরপশুকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো হোক। দু একটা ষণ্ডা তার দিকে তখন এগিয়ে আসছে।

বাঁড়ুয্যের মনে অবস্থা কল্পনা করুন। চেন টানার ব্যবস্থা থাকলেও সেদিকেও দুশমনদের ভিড়। সে বিকল অবশ। এ রকম অবশ্য-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে কটা লোক?

একজন তার দু'বাহুতে হাত দিয়ে ধরতেই কম্পার্টমেণ্টের এক কোণ থেকে হুঙ্কার এল, 'ঠহ্‌রো'। সবাই সেদিকে তাকাল। এক অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপরের দিকে হাত তুলেছেন। ইনি এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ দেন নি।

বললেন, 'সাধুরা সব শোনো। এঁর গায়ে হাত তুলো না। ইনি কি ধরনের সন্ন্যাসী তোমরা জান না। উনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের এক জাতের সন্ন্যাসীকে সবকিছু খেতে হয়, লজ্জা ঘৃণা ভয় ওঁদের ত্যাগ করতে হয়। শুধু ত্যাগ নয়, সানন্দে গ্রহণ করতে হয়। ইনি সেই শ্রেণীর সন্ন্যাসী। তোমরা ত জান না, সন্ন্যাসের গুরু বুদ্ধদেব শূয়োরের মাংস খেয়ে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এঁকে একদিন ঐ পর্যায়ে উঠতে হবে। মৃত্যু-ভয় এঁর নেই। দেখলে না উনি এখন পর্যন্ত একটি মাত্র শব্দ করেন নি। ঘৃণা এবং ভয় থেকে উনি মুক্ত হয়েছেন। বোধহয় একমাত্র লজ্জা-জয়টি এখনো ওঁর হয় নি। তাই এখনো পরনে লজ্জাবরণ। সেও উনি একদিন জয় করবেন।

তোমরা ওঁর গায়ে হাত দিয়ো না।'

কতখানি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর যুক্তিবাদের ফলে, কতখানি তাঁর সৌম্য-দর্শন শান্ত বচনের ফলে মারমুখো সন্ন্যাসীরা ঠাণ্ডা হল বলা কঠিন।

বাঁড়ুয্যে সে যাত্রায় বেঁচে গেল।

দু-তিন স্টেশন পরই সব সন্ন্যাসী নেমে গেল ঐ বৃদ্ধ ছাড়া।

তখন তিনি বাঁড়ুয্যেকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবুজী, এ যাত্রায় ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছ, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো।'

সেই থেকে ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সন্ধান আমি প্রতি তীর্থেই করি। উনি যদি একবার, আমার গৃহিণীকে বুঝিয়ে দেন, আমিও একটা অবধূত-টবধূত তাহলে ওর খাই-বয়নাক্কা-নথঝামটা থেকে নিষ্কৃতি পাই। দশটা মারমুখো সন্ন্যাসীকে ঠাণ্ডা করতে পারলেন আর ওকে পারবেন না? কি জানি।

ছিল একদিন পরিচয় হয় নাই,
এল সেই দিন, তবে কেন দুখ পাই?
ছিল একদিন তোমারে চিনি নি যবে
এখন চেন না ; তবে কেন দুখ হবে?
একদিন ছিল, দোহাতে অপরিচয়
ছাড়াছাড়ি হল , তবে কেন দুখ ভয়?
একদিন ছিল চেনাশোনা হয় নাই
আবার তেমনি, তবে কেন ব্যথা পাই?
অচেনা যখন ছিলে
ছিল না তো মোর দুখ
এখন চেন না ফের
ঘুচে গেল কেন সুখ?

গেজেটেড অফিসার কবি

এ সংসারে দীনবন্ধুর বড়ই অভাব। তবে জগবন্ধুর কল্যাণে এ অধমের দু'একজন আছেন। তাঁরা মাঝে-মধ্যে দয়া করে আমাকে দু'একখানা অতিশয় উচ্চাঙ্গের, সাতিশয় 'হাইব্রাও'—'উন্নাসিক' মাসিক পাঠান। আগের দিন হলে আমার আর কোনো দুঃখ রইত না। এসব মাসিক থেকে চুরি করে হপ্তার পর হপ্তা দিব্য অরিজিনাল লেখা লিখে দেশে নাম করে ফেলতুম, কারণ এদেশে ক'টা গোটে আছেন যে আমার লেখা পড়ে বলবেন, 'মহাশয়, আপনার লেখাতে অনেক অরিজনাল এবং অনেক সুন্দর কথা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেগুলো অরিজিনাল সেগুলো সুন্দর নয়, আর যেগুলো সুন্দর সেগুলো অরিজিনাল নয়।' চুরি করতে এখন অসুবিধাটা কি? সবচেয়ে বড় অসুবিধা, ত্রিশ বৎসর আগেও আমি এসব লেখা পড়ে বেশ বুঝতে পারতুম, এখন আর পারি নে। তার কারণ এখন ইয়োরোপীয় লেখকের অধিকাংশই, ইংরিজিতে যাকে বলে বিউইলডার্ড—হতভম্ব, দিক্‌ভ্রান্ত, মাথাগুবলেট—যা খুশী বলতে পারেন। নিজের কৃষ্টি-কলার সম্বন্ধে এদের মনে দ্বিধা, হৃদয় দ্বন্দ্বের অন্ত নেই; শ্লীল অশ্লীল বিবেচনা করতে গিয়ে লেডি চ্যাটার্লির মত সাধারণ বই এদের তালুক-মুলুক-কুল্লে দেশে হালের চাটগাঁইয়া সাইক্লোন তোলে, এক দেশের বড় পাদ্রী অন্য দেশের বড় পাদ্রীর সঙ্গে সামান্য লৌকিকতার দেখা করতে গেলে তারা হুররা রব ছেড়ে বলে, এবারে তাবৎ মুশকিল আসান, ঘাড় ঘাড় কলচরল কনফারেন্স গড়িখড়ি ফের নেশার অবসাদ, পুনরায় খোঁয়ারি—

আর সর্বক্ষণ আর্তরব। ঐ এলরে ঐ খেলরে। কে? কম্যুনিস্ট। এঁরা এই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মনস্থির করে ফেলেছেন যে কম্যুনিস্ট এলে এঁদের আর কোনো গতি নেই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিলকুল বরবাদ হবে। সারি বেঁধে সবাই সাইবেরিয়া।

ওদিকে কম্যুনিস্টরা অভয় দিয়ে বলছে, 'আমরা এলেই তো

তোমাদের পরিত্রাণ, ধনপতিদের অত্যাচারে খেতে পাবছো না, পরতে পাও না, রাষ্ট্র তোমাদেব জন্য কড়ে আঙুলটি তোলে না, বস্তা-পচা ধর্মেব আফিঙ পর্যন্ত এখন যে তোমাদের নেশায় বুঁদ কবে রাখবে তারও উপায় নেই, ইত্যাদি অনেক মূল্যবান কথা।

পশ্চিম ইয়োরোপের লেখকরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়বাণী, যে তারা এলে পর ক্যাপিটালিস্ট দেশের লেখকবা অন্ততপক্ষে খেয়ে পরে বাঁচবে, কতখানি মনে মনে বিশ্বাস করেন সে-কথা বলা কঠিন; কিন্তু তাঁরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়বাণীর একটি পাবপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন।

সেইটে ইদানীং একটি পত্রিকাতে সরল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। ঐটেই নিবেদন করি। বাকি—ঐ যে বললুম—বিউইলডার্ড জিনিস, সে তো আর চুরি করা যায় না, খালি-পকেট মারা যায় না, কিংবা বলতে পারেন। হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা যায় না।

সুইডেন থেকে জনৈক সংবাদদাতা তাঁর দেশের খবরের কাগজে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, সে দেশের লেখকেরা তাঁদের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারকে উদ্বাস্ত করে তুলেছেন (এ স্থলে আমার মন্তব্য, ভাবটা এই, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে লেখক কত সুখে আছে, এদিকে তোমার তথাকথিত জনকল্যাণ রাষ্ট্র আমাদের জন্য কিছুই কবছে না, অনেকটা পাশের বাড়িব চাটুয্যে তার গিন্নীকে কি রকম গয়না দিয়েছে ছাখো গো গোছ) পত্রলেখক সুইডেনের লেখকসম্প্রদায় সরকার থেকে যেসব অর্থ সাহায্য পান তাব যে সাবস্তর নির্ঘন্ট দিয়েছেন তার থেকে মাত্র একটি আমি তুলে দিচ্ছি—এ দেশে চালালে মন্দ হয় না—সাধারণ পাঠাগাব থেকে যে পাঠক ধাব নিয়ে বই পড়ে তার প্রত্যেক বাবেব জন্য সবকার—পাঠক নয়—লেখককে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন। সেটা সামান্যই, কিন্তু জনপ্রিয় লেখকের কাছে সেটা কিছু সামান্য নয়।

হালে তাই ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের লেখক-

সম্প্রদায়ের মুরুব্বিরা সমবেত হয়ে রেডিয়ো ও টেলিভিজনে তাঁদের ফরিয়াদ ক্রন্দন শুনিয়েছেন ও দেখিয়েছেন। হেলসিঙ্কি শহরের তালকিসৎ বললেন 'সরকার লেখকদের বই কিনে পাঠাগারে পাঠাগারে ফ্রী বিতরণ করে পাঠককে বদলে দেন করুণার মুষ্টি-ভিক্ষা (উপরে যেটা উল্লেখ করেছি)। অপিচ, পশ্য-পশ্য, ঐ লেখক নামক জীবটি না থাকলে তামাম বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতো। প্রকাশক, মুদ্রাকর দপ্তরী, পুস্তক-বিক্রেতা এমন কি, পুস্তক-সমালোচকের পর্যন্ত পাকা পোক্ত আমদানি আছে, নেই কেবল লেখকের, যাকে সর্বক্ষণ কাঁপতে হয় অনিশ্চয়তার ভয়ে ভয়ে। সুইডিশ লেখক-সম্প্রদায়ের প্রধান মুরুব্বি বললেন, 'পূর্বে লেখক ছিল গরীবদের মধ্যে একজন গরীব, আজ সে-ই একমাত্র গরীব।' যখন অকরুণ ইঙ্গিত করা হল, আজকের দিনে লেখকদেরও বড্ড বেশী ছড়াছড়ি, তখন তিনি বললেন, হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য শুধু পাহাড়ের চুড়োয় নির্মিত হয় না'।

শেষ পর্যন্ত এঁরা দাবী জানিয়েছে, সরকারকে ওরকম ভিক্ষে দিলে চলবে না। (বর্তমান লেখকের মন্তব্য) ব্যক্তিগতভাবে আমার কণা পরিমাণ ভিক্ষা নিতে কণামাত্র আপত্তি নেই ; দিতে হবে পাকা পোক্ত মাইনে। তবেই সে নিশ্চিন্ত মনে, পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন সৃষ্টিকার্য করে যেতে পারবে, এবং তার জন্য সে সরকারের কাছে বাধ্যবাধক হবে না (রাশার প্রতি ইঙ্গিত নাকি ?)। এদের মতে সরকার এবং ফ্রী পাঠাগার থেকে লেখকরা বর্তমানে যা পান সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলেও তাঁরা সে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, যার কৃপায়, অন্য চাকরি না করে তারা দারাপুত্র পোষণ করে আপন কার্যে মন দিতে পারবেন।

তারপর ইংরেজ, যুগোস্লাভ, সুইডিশ ও জর্মন লেখকরা আপন আপন দেশ থেকেই টেলিফোন যোগে আপন আপন মন্তব্য সুইডেনে পাঠালেন ও সেখানকার বেতারকেন্দ্র থেকে সেগুলো বিশ্ব-সংসারের জন্য বেতারিত হল।

জর্মনির হাইনরিষ ব্যোল বললেন,'ঈশ্বর রক্ষতু (ফর হেঁভেন্‌স্ সেক, উম্ হিমেল্‌স্ বিলেন)! সর্বনাশ হবে—লেখক যদি সরকারের মাইনে-খোর হয়। সে সৃষ্টির কাজ করে যাবে নিছক সৃষ্টিরই জন্যে। এই আমাদের জর্মনিতে পঁয়ত্রিশ হাজার লেখক আছেন (সর্বনাশ! এই সোনার বাঙলায় পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেতা নেই)। কে এমন মাপকাঠি বের করবে যা দিয়ে স্থির করা হবে, কোন লেখক কত পাবেন? কৃতকার্য লেখকই যে মূল্যবান লেখক এ কথা বলে কে (সাক্‌সেস এবং কোয়ালিটি সমার্থসূচক নয়)।'

লণ্ডন থেকে রবার্ট গ্রেভসেরও বিচলিত কণ্ঠস্বর সোনা গেল, 'আমার আটটি সন্তান। সত্য বলতে কি, এদের পালা-পোষা আমার পক্ষে সব সময় সহজ হয় নি। তাই বলে যে-কাজ আমি এখনো আদপেই করি নি তার জন্য আগেভাগেই পয়সা নিয়ে বসবো? ইংরিজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'হি হু পেজ দি পেইপার কলস দি ট্যু—যে কড়ি ফেলে সে-ই হুকুম দেয়, কোন্ সুর গাইতে হবে।' আমি আমার ইচ্ছেমত যে সুর গাইব।

আর বেলগ্রেড থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল. ডুসান মাটিকের,—'না, দয়া করে চাকুরে কবি তৈরি করতে যাবেন না। আমরা কারো চাকরি করি নে। কবিতা রচনা করা আর ফর্ম ফিল আপ্ করা এক কাজ নয়।' মানুষকে লেখক হবার জন্য জোর করা যায় না, কবিতা রচনা করার সময় কোনো কবি কর্তব্য বোধ থেকে তা করে না, বরঞ্চ সে রচে যখন ভিতরকার তাড়না সে আর থামিয়ে রাখতে পারে না। কি করে মানুষ যে কবিকে সরকারী চাকুরে বানাবে তাতো আমার বুদ্ধির অগম্য…।'

এসব নিদারুণ মন্তব্য শোনার পরও কিন্তু সুইডেনের ঔপন্যাসিক ফল্‌কে ইসাকসন তাঁর সুইডিশ নৌকোর হাল ছাড়লেন না অর্থাৎ সরকারী সাহায্যের প্রস্তাবটা বললেন, 'কত ভালো লেখক দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যায় এমনই ভারগ্রস্ত যে, লেখার কাজ করে উঠতে

পারেন না।' সরকারের কিছু একটা করা উচিত···। তার মানে এই নয়, সুইডেনের সব লেখকেই এই মত পোষণ করেন। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আর্কে ভাসিং বলেছেন, 'প্রচুর, প্রচুর আমি শিখেছি মানব-চরিত্রের, গড়ে তুলেছি আমার জীবনদর্শন, আমার জীবনের পেশা থেকে।' এঁর পেশা দারোয়ানি। অর্থাৎ বাড়ির দরওয়ান। পত্রলেখক জাল্ংসার চিঠি শেষ করেছেন এই মন্তব্য করে, 'বাড়ির দরওয়ানই যদি এত ভালো লেখে তবে চিন্তা করো, বড় হোটেলের পোর্টার (দর-ওয়ান তো) আর কত শতগুণে ভালো লিখবে।' অর্থাৎ কাকতালীয়।

লেখাটি পড়ে শোনাতে আমার একজন প্রিয় লেখক-বন্ধু আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'বলেন কি মশাই। ওসব দেশে পাঠক যখন প্রতিবার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তার জন্য সরকার লেখককে পয়সা দেয়! আর এদেশের লাইব্রেরি আমার কাছ থেকে ফ্রী বই চায়। বইটার দাম পর্যন্ত দিতে চায় না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললুম, 'গরীব দেশ।' তারপর বললুম, 'একটু ভেবে দেখুন। না চাইলে কি আরো ভাল হত? একদম পড়তেই চায় না, সেটা কি আরো ভালো হত? প্রিয়ার বিরহ বেদনা পীড়া-দায়ক ; কিন্তু যার একদম কোনো প্রিয়াই নেই?'

বন্ধু অধৈর্য হয়ে শুধোলেন, 'তোমার কাছে চাইলে তুমি কি করতে?'

আমার চিত্তে সহসা কবিত্বের উদয় হল। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলুম।

আধপাগল × ২ = পুরোপাগল

গম্ভীরে অঙ্কের গুরু ক্লাসে বসি কন,
"অঙ্ক দেবো ; উত্তরো তো সব বাপধন।
ইস্কুল-বাড়িতে আছে যে কয়টা ঘর
তার সাথে যোগ দাও, তোমার নম্বর।

তা থেকে বিয়োগ করো গত বৎসরের
সূর্যগ্রহণের সংখ্যা। তার পর ফের
যোগ করো যার যার পিসীর বয়েস
তার সাথে। ভাগ করো যে কটা সন্দেশ
এ পুজোতে খেয়েছিলে—তাই দিয়ে।
শেষ ফল হয়ে গেলে তারই খেই ধরে
আমার বয়েস কত বলো চট-করে।"

তাজ্জব বেবাক ক্লাস! এরে অঙ্ক কয়!
লসাগু, গসাগু, হাসজারু তো নয়।
ফেলিলা গুরুজী আজ আজব এ ফাঁদে
হুংকারিয়া তিনি কন, "দে—উত্তরটা দে।"

তখন একটি ছেলে গোবেচারী হেন
টিঙটিঙে, ধড়ে তার প্রাণ নেই যেন।
সবিনয় কণ্ঠে কয়—বড় অমায়িক
(মাইক ছিল না ক্লাসে অ-মাইক ঠিক।)

"বয়েস চাল্লিশ তব মোর অঙ্ক কয়।"
"শাবাশ" হাঁকেন গুরু, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।
কিন্তু বৎস, ফল বলে পাবে না খালাস
স্টেপগুলো সাবিস্তর করহ প্রকাশ।"

চুলকালো মাথাটিরে ছাত্রটি মোদের
কষ্টে কাষ্ঠ কণ্ঠ হতে শব্দ করে বের :
"মোদের পাড়ার মধু আধা সে পাগল।
বয়েস তাহার কুড়ি নেই কোনো গোল।
তাহলে চাল্লিশ তব্ব সন্দেহ কি তায়!"
তার পর দিল ছুট—গুরু পিছে ধায়॥